দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করেছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ — পৃঃ ৬

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির মুখোশ চিনিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ — পৃঃ ১৫

৭৩ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ৫ জুলাই, ২০২১।। ২০ আষাঢ় - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

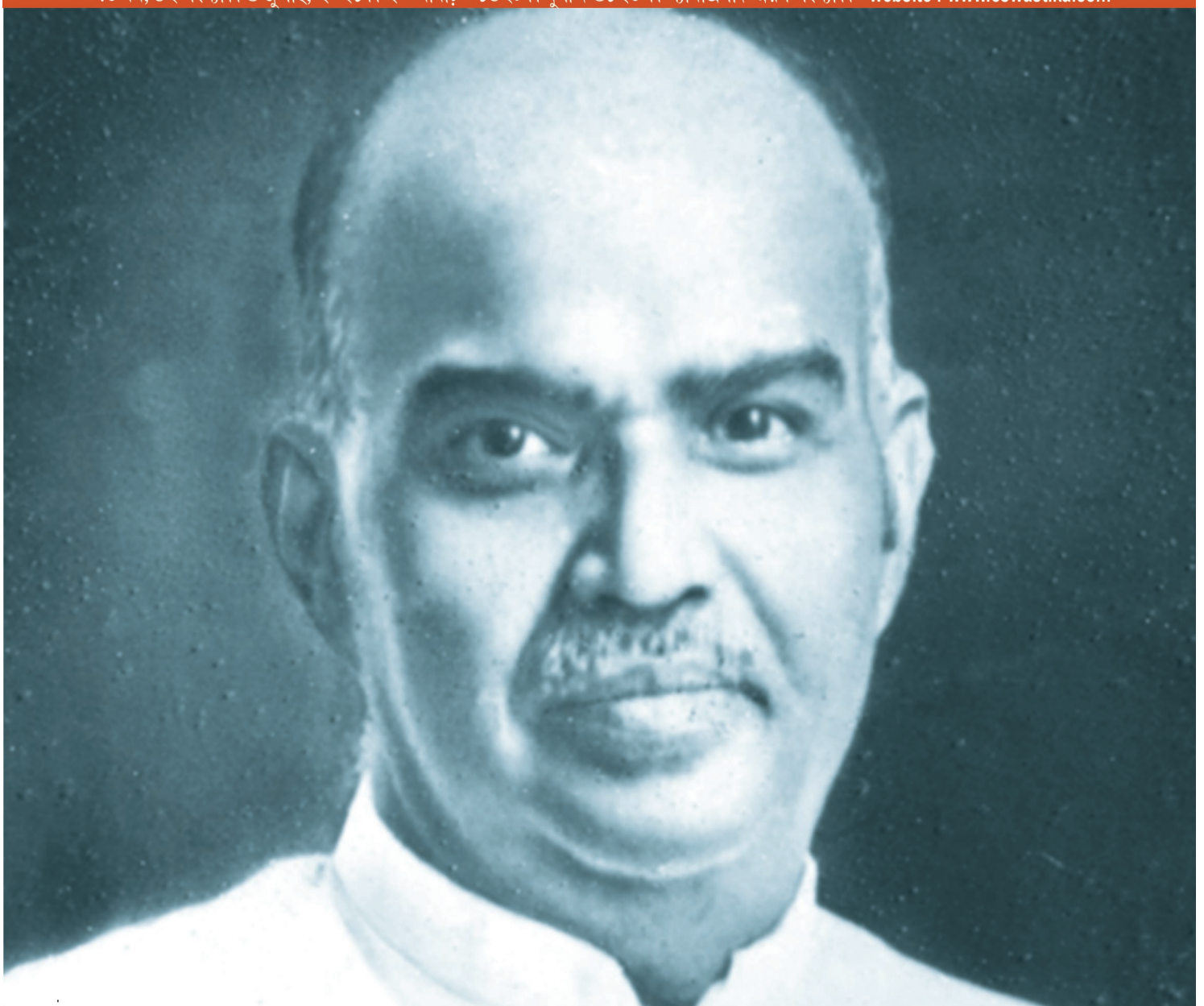

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি

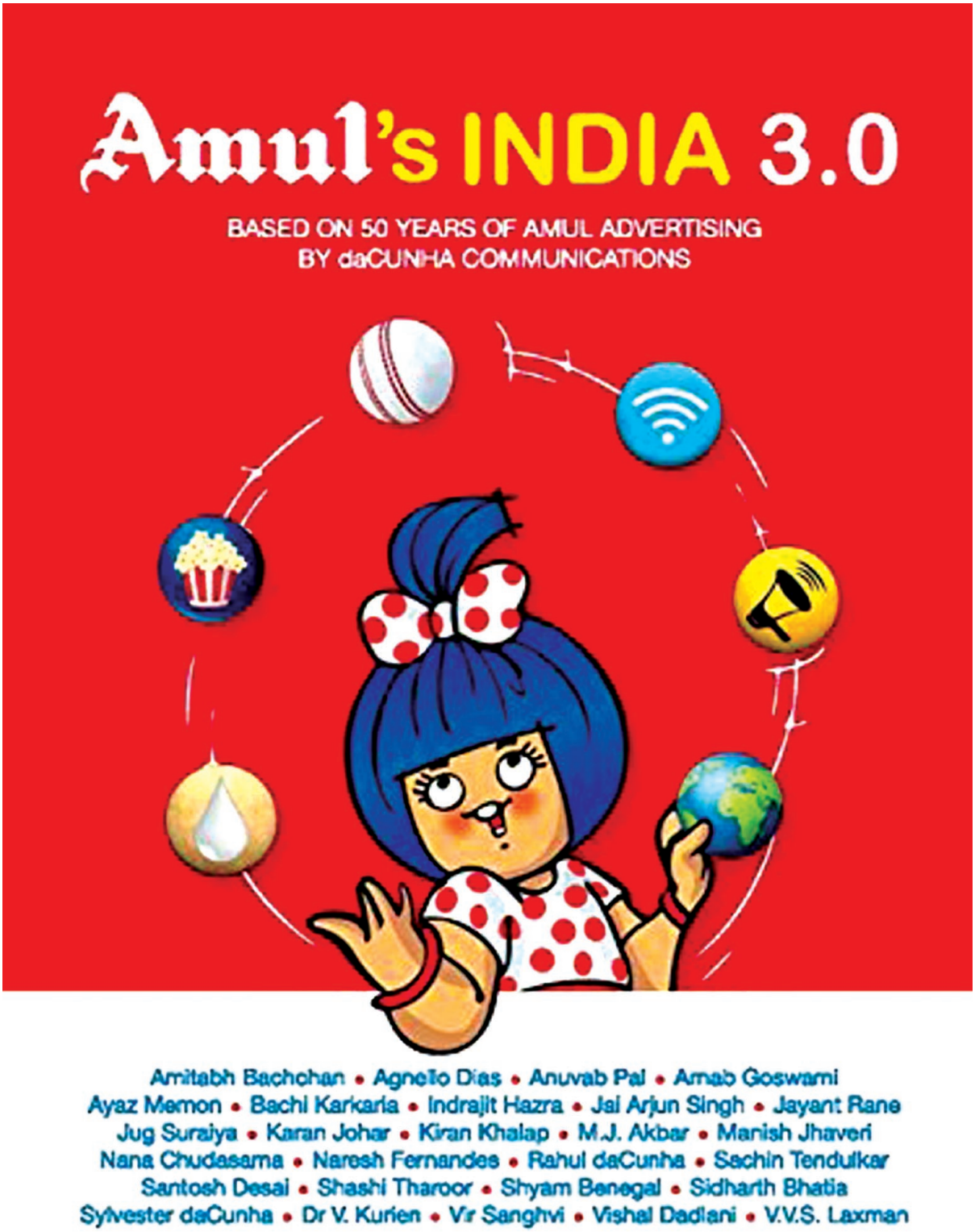
Amul's INDIA 3.0
BASED ON 50 YEARS OF AMUL ADVERTISING
BY daCUNHA COMMUNICATIONS
Amitabh Bachchan • Agnello Dias • Anuvab Pal • Arnab Goswami
Ayaz Memon • Bachi Karkaria • Indrajit Hazra • Jai Arjun Singh • Jayant Rane
Jug Suraiya • Karan Johar • Kiran Khalap • M.J. Akbar • Manish Jhaveri
Nana Chudasama • Naresh Fernandes • Rahul daCunha • Sachin Tendulkar
Santosh Desai • Shashi Tharoor • Shyam Benegal • Sidharth Bhatia
Sylvester daCunha • Dr V. Kurien • Vir Sanghvi • Vishal Dadlani • V.V.S. Laxman

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।।

৭৩ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২০ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৫ জুলাই - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

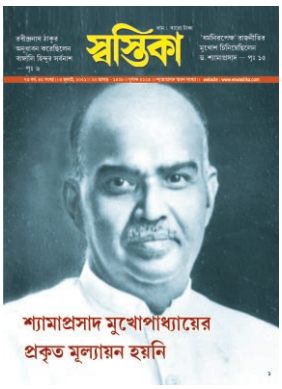

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করেছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ
▯ অমিত দাশ ▯ ৬

শিক্ষাবিদ হিসাবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৮

শিবাজীর রাজপতাকা, হিন্দু জাতি-গঠন-ভাবনা এবং স্বামী প্রণবানন্দ ও ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে তার উত্তরাধিকার
▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ১১

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির মুখোশ চিনিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ ▯ সুজিত রায় ▯ ১৫

মানব দরদি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২১

ড. শ্যামাপ্রসাদ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন
▯ অম্লান কুসুম ঘোষ ▯ ২৭

সর্বধর্ম সমভাবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ▯ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ▯ ২৯

পক্ষপাত দুষ্ট আমলাগণ দেশের সার্বিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ৩১

বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩২

অসমের কর্মযোগী মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন
▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৩৫

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা?
▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৩৭

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, তাহা প্রশ্নাতীত। তাহা হইলেও বলা যায়, তিনি আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা। তাহার চাইতে বড়ো কথা, তিনি বাঙ্গালি হিন্দুর ত্রাণ ও রক্ষাকর্তা। তাঁহার জন্যই উদ্বাস্তু বাঙ্গালি হিন্দু এক খণ্ড ভূমি পাইয়া মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু অন্তত জোগাড় করিতে পারিয়াছে। শুধুমাত্র এই পরিচয়টুকুর সুবাদেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আপামর বাঙ্গালি সর্বদা স্মরণ করিবে। সুতরাং ১৯৫৩ সালে আত্মবলিদানের সময়ে তাঁহার যে প্রাসঙ্গিকতা ছিল, প্রয়াণের আটষট্টি বৎসর পরেও তিনি সমধিক প্রাসঙ্গিকতা লাভ করিয়াছেন। এই সত্যটুকু সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার কর্মের ব্যাপ্তি শুধু পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত ছিল না। সমগ্র ভারতের একতা সাধনে তাঁর অপরিসীম কর্মতৎপরতা চিরকাল ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে। দেশের সংবিধানে ৩৭০ ধারার বলে কাশ্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল, যাহার সুযোগ লইয়া কাশ্মীরের তদানীন্তন 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী' শেখ আবদুল্লা 'ত্রিজাতি তত্ত্ব' (থ্রি নেশন থিওরি) উত্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার তীব্র বিরোধিতা তিনি করিয়াছিলেন। তিনি 'অখণ্ড ভারতে'র নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন— 'এক দেশে দুই প্রধান, দুই বিধান, দুই নিশান চলিবে না।' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের ছেষট্টি বৎসর পরে তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইয়াছে ২০১৯ সালে, যেদিন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু-কাশ্মীর হইতে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তের কথা সংসদে পাশ করাইয়া লইলেন। তাহা যে আদতে শ্যামাপ্রসাদের আত্মত্যাগের প্রতিই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হইল তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর নিকট শ্যামাপ্রসাদের প্রাসঙ্গিকতা যে কখনও শেষ হইবে না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশে অধিকাংশ সময় কংগ্রেসি শাসন এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট শাসন বলবৎ থাকায় এই মহান দেশনেতা রাজনৈতিকভাবে বহুকাল অচ্ছুতই থাকিয়াছেন। সেই সঙ্গে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো স্বনামধন্য ইতিহাসবিদদের ব্রাত্য করিয়া ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্রদের মতো কমিউনিস্ট পার্টি ক্যাডারদের 'ইতিহাসবিদ' সাজাইয়া তাহাদের ওপর ইতিহাস 'সৃষ্টি'র ভার ন্যস্ত হইলে শ্যামাপ্রসাদ যে শুধুমাত্র লাঞ্ছিতই হইবেন না, উপরন্তু তাঁহাকে লইয়া গালগল্প তৈরি করিয়া অবমাননাকর প্রচার চলিবে, পশ্চিমবঙ্গ তৈরিতে তাঁহার অবদানকে অহরহ অস্বীকার করা হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। 'অখণ্ড বঙ্গে'র অজুহাতে আর একটি ইসলামিক দেশ তৈরিতে সেদিন কিছু কংগ্রেস নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ মদত ছিল। সুতরাং ইহাদের উত্তরসূরীরা যে নীতিগতভাবে শ্যামাপ্রসাদের চরমতম বিরোধী হইবেন তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্যের হইল, এই নীতিগত বিরোধকে তাঁরা এই পর্যায়ে নামাইবেন যে, মিথ্যা 'গল্প' ফাঁদিয়া তাঁহার চরিত্র হননে সচেষ্ট হইবে।

দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ভারতছাড় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সম্ভবত, কমিউনিস্টদের তৎকালে ব্রিটিশদের হয়ে তাঁবেদারি হইতে দৃষ্টি ঘোরানোর নিমিত্ত এইরূপ অভিযোগ। তাই অটলবিহারী বাজপেয়ী হইতে শ্যামাপ্রসাদ— সকলেই ভারতছাড় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, এই রটনা সর্বত্র চলিতেছে। অথচ ইতিহাস বলে, ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনে সক্রিয় যোগদানকারী হিন্দুদের ওপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্যায় ভাবে বিভিন্ন কর আরোপ করিলে, এমনকী ওই বৎসর দুর্গাপুজোর সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়ায় স্থানীয় হিন্দুরা খুবই কষ্টের মধ্যে পড়িলে বাঙ্গলা সরকারের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ পথমধ্যে ইংরেজদের বহু বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মেদিনীপুরে পৌঁছান এবং ইহার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেন।

শিক্ষা সংস্কারক হিসাবে তাঁর অবদানও স্মর্তব্য। তিনি উপাচার্য থাকাকালীনই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় প্রথমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিয়াছিলেন। সব মিলাইয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আজিকার প্রজন্মের জানিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। 'স্বস্তিকা' পত্রিকা বিগত সাত দশক এই কাজটিই নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। আমরা মনে করি, তাঁহাকে পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের দুর্দশার কারণ, কীসে তাহার বিপত্তি, কী করিলেই-বা আগামীতে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইবে, তাহা অনুধাবন করিতে পারা যাইবে। জয়তু শ্যামাপ্রসাদ, জয়তু দেশমাতৃকা, বন্দেমাতরম্।

সুভাষিতম্

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্।।

বীর, বুদ্ধিমান ও সেবাভাবী—এই তিন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল স্বর্ণপুষ্পরূপ পৃথিবী লাভ করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করেছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ

অমিত দাশ

মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী প্রবণতায় হিন্দু সমাজপতিদের নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন--- '...তর্করত্নদের প্রপৌত্রমণ্ডলীকে মুসলমান যখন জোর করে কলমা পড়াবে তখন পরিতাপ করবারও সময় থাকবে না।' (চিঠিপত্র-৯)

মানুষ একজন মহান কবিকে ঋষির মর্যাদা দিয়ে থাকেন। চর্মচক্ষু দ্বারা যা দেখা যায়, তিনি তার চাইতে কিছু বেশি দেখতে পান— এমনকী দূরের জিনিসও। সেই কারণে তিনি দূরদ্রষ্টাও। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন হিন্দু বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ।

একদা সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'যে মুসলমানকে আজ ওরা সকল রকম প্রশ্রয় দিচ্ছে সেই মুসলমানই একদিন মুষল ধরবে।' (চিঠিপত্র-১১)

'মুষল' পর্বটি সম্পন্ন হবার পূর্বে সলতে পাকানোর পর্বসমূহ, বিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন দশককাল জুড়ে মুসলমানদের নানা ধরনের আবদার— যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সে স্থানে তো বটেই, যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও আইনসভা, সরকারি চাকরি ইত্যাদিতে যুক্তিহীন অধিকমাত্রায় সংরক্ষণের দাবি, বাংলাভাষায় অনাবশ্যক আরবি শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জবরদস্তি, বন্দেমাতরম্ সংগীত নিয়ে আপত্তি, ক্রমবর্ধমান হিন্দু নারী অপহরণের পর্বসমূহ জীবনকালেই প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুসলমানদের অধিকাংশের বিচারে 'বীরত্বের' (!) এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মতে তাদের অতি প্রিয় (শরৎ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৩ হিন্দু নারী-অপহরণের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতার মাধ্যমে ইতিহাসে 'চিরস্মরণীয়' হয়েছে কলঙ্কিত স্মৃতি হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের মাত্র পাঁচ-ছয় বছর পর ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ মুষল পর্বটি প্রথম অধ্যায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হবার পূর্বে সলতে পাকানো হয়েছে কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের গণহত্যা, নোয়াখালির হিন্দুনিধনযজ্ঞ, উল্লখিত ১৪ দফা দাবি ইত্যাদির মাধ্যমে।

পর্বটি সম্পন্ন হবার পর যে হিন্দু বাঙ্গালিকে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য চোকাতে হয়েছে, মাত্র সাত দশককাল সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুষল পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় আবারও তাদেরই দোরগোড়ায় তাল ঠুকতে আরম্ভ করেছে।

কেউ বলবেন না মুসলমান বলে তার অধিকার কম। মানুষ বলেই সে সমান পাবার যোগ্য। মানুষ বলেই যে আধুনিক শিক্ষা পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি জানাতেই পারে। তাকে মাদ্রাসা-মোক্তাব দিয়ে তোয়াজ করে তার সামূহিক সর্বনাশ শুধু তার একার নয়, সমস্ত দেশের।

বাস্তুচ্যুত হবার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল পূর্ববাঙ্গের মানুষ, খুব তাড়াতাড়িই সে অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তরদিনাজপুর, নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলের হিন্দু বাঙ্গালিকে। লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, নিহত হবার যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির হয়েছে, তা থেকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালিই-বা কেন বঞ্চিত থাকবেন!

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ায় মানুষকে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীকে বার বার প্রতারিত হতে হবে— এমনটি সম্ভবত এই বাঙ্গলার হিন্দুদেরই একান্ত নিজস্ব ভবিতব্য।

রাষ্ট্র ভাঙাভাঙির জন্য কার দোষ বেশি, কার কম সেসব নিয়ে চাপান-উতোরের উপকরণ দেশের পাণ্ডিত্যজীবীদের হেফাজতে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, গবেষণা এবং গবেষণাপত্রের উদ্ধার হয়েছে অনেক। এরই মাঝে বাঙ্গালি হিন্দুর ভাগ্য চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটকের চিত্রায়িত নবইহুদির ক্ষণকালীন রূপ খসিয়ে শনৈ শনৈ চিরন্তন রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে।

প্রসঙ্গত, ঋত্বিক ঘটক কর্তৃক চিত্রায়িত বাস্তুচ্যুত হিন্দু জীবনের বর্ণনায় জনৈক চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ বন্ধু 'হিন্দু আইকন' ব্যবহারের অপরাধ আবিষ্কার করেছেন! এ যেন ধর্মান্ধ মুসলমানদের উপর ধর্মান্ধতর মুসলমানদের প্রহারের মতোই সেকুলারবাদীদের উপর নবসেকুলারবাদীদের চড়াও হবারই এক উদাহরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মুসলমানরা কখনোই ভারতীয় সমাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি তার বড়ো কারণ নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত, এই জন্য তাদের

ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।' (রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০)। যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় হিন্দুদের আরও কিছু পরিমাণে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলেও ঈপ্সিত ফল লাভ হতো না সেকথা বলাবাহুল্য।

শরৎচন্দ্র বলেছেন— 'হিন্দু-মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ওই গালভরানো অতিরিক্ত সে আর কোনো কাজেই আসে নাই' (শরৎ রচনাবলী, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৩)।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে, হিন্দুদের ধরে ধরে মুসলমান করে দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই।

স্বভাবতই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মসৃণ হবে তেমন আশা করেননি কোনো মনীষীই। রবীন্দ্রনাথের মতো উদার মানুষও যিনি প্রথমবার নিজেদের পারিবারিক জামিদারিতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য বসবার পৃথক ব্যবস্থা দেখে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তিনিও একসময় অনুভব করেছেন— 'ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরপর রফা-নিষ্পত্তির কারণ ঘটবে' (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৮)।

১৯৪৭ সালে লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ ঘটিয়ে এবং ভারত ভাগ করে যাঁরা রফা-নিষ্পত্তিকে একটি স্থায়ী রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তাঁদের 'ভাঙি তবু মচকাই না' মনোভাবের জন্য তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মের নামে দেশভাগ হলো অথচ জনবিনিময় হলো না— যেন দেশ নিতান্ত মানুষ নিরপেক্ষ, দেশের মানুষের মৌলিক স্বার্থ নিরপেক্ষ ভূখণ্ডমাত্র! মাঝে মাঝে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলা ভাগের খলনায়ক সাজানোর চেষ্টা যারা করেছেন তাদের স্মরণ করানো প্রয়োজন তৎকালীন যে বিধানসভা বাঙ্গলা বিভাজনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার সদস্য ছিলেন দুই কমিউনিস্ট সদস্যও— জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। তাঁরা কেউ-ই বাঙ্গলা ভাগের বিরোধিতা করে কোনো কিছুই বিবৃতি দেননি, ভোটদানে বিরতও থাকেননি। কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'People's War'-এ ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট সংখ্যায় লেখা হয়েছে— 'Pakistan is a just demand for Muslim homelands'। স্বয়ং জিন্নাও তখনও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁরা পাকিস্তান গড়তে পারবেন।

মুসলমি লিগ ভারত ভাগ করেছিল, শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানকে শুরুতেই ভাঙতে পেরেছিলেন। তা না হলে বাঙ্গালি হিন্দু যতজন আজও অবশিষ্ট আছেন, তারা সকলেই হতেন ইসলামিক পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক; ইসলামের ভাষায় 'জিম্মি'।

কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যার সময় গান্ধীজী হিন্দুদের মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। হিন্দু নারীদের বলেছিলেন মুসলমান নরপশুদের অত্যাচার সহ্য করতে না পারলে তাদের উচিত হবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা না করে আত্মহত্যা করা।

বহুকাল পূর্বে গান্ধী হিন্দুদের মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'যদি আন্তরিকভাবে কোনো জিনিস অন্যায় বলিয়াই বোঝা যায়, আপোশ-নিষ্পত্তির খাতিরে তাহা মানিয়া লওয়াতে স্থায়ী শান্তি ঘটিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে, ১৯৩১)।

আত্মসমর্পণে অরাজি পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী সিংহভাগ হিন্দু ১৯৪৭-৫০-এর মধ্যেই ছেড়ে এসেছেন নিজেদের জন্মভিটা। এখনও চলেছে সেই পর্ব। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে ২৮ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশে এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা হয়েছে ৩০ শতাংশ।

স্বভাবতই অতি স্বাভাবিক কারণে দেশভাগের পূর্বেও পরিস্থিতি দস্তুরমতো সর্বগ্রাসী ও বিস্তৃত হয়ে চলেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। তারই নজির ভালো করে বোঝা গেল ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনের পরে।

পাড়ায় পাড়ায় মুসলমানরা আক্রমণ করলো দলমত নির্বিশেষে হিন্দুদের বাড়ি-দোকান ইত্যাদি। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের সংখ্যা এবং ভয়াবহতায় বোঝার উপায় ছিল না মানুষ কোথায় বাস করছেন। সময় যন্ত্রের কারিকুরিতে দেশ কি ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার দিনগুলিতে ফিরে গেল? সেসকল বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন হলেও হাওড়ার শক্তিনগরের জনৈক ভদ্রলোকের পাঠানো ভিডিয়োটির উল্লেখ করবার তাগিদ এড়ানো গেলো না। ভদ্রলোক জানিয়েছেন তাদের অঞ্চলের পাশে বসবাসরত মুসলমানরা কীভাবে বাড়িঘর আক্রমণ করে ধ্বংসকার্য চালিয়েছে। জানিয়েছেন তিনি বিজেপি বিরোধী তবু আক্রমণকারীরা তাকেও রেহাই দেয়নি (ভদ্রলোকের কথাবার্তায় মনে হলো তিনি বামপন্থী এবং শুধু বিজেপি সমর্থকদের আক্রমণ করলে তিনি ততটা অবাক হতেন না!)। ভদ্রলোককে জানানো উচিত— এ তো সবে কলির সন্ধ্যা, সামনে অনেক খেলা যে বাকি আছে! পশ্চিমবঙ্গে খেলার মহড়া দেখলেন মাত্র। উপরোক্ত ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭-এ মুসলমান জেহাদিরা যেমন জানতে চায়নি কে তাদের বন্ধু কমিউনিস্ট আর কে কংগ্রেস অথবা হিন্দুমহাসভার মানুষ। হিন্দুরাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য, সে সন্ধিক্ষণ আবার সমাগত।

উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুজে আত্মরক্ষায় উন্মুখ হিন্দু, আত্মসমর্পণে উদ্‌গ্রীব হিন্দুরা তাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রদের জন্য কোন্ দেশ রেখে যেতে চলেছেন? সর্বক্ষণ গৃহযুদ্ধে দীর্ণ এক ভূখণ্ডে যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়ির বারান্দায়, জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা-বাবা বা অন্য প্রিয়জনেরা। একটা দিন অতিক্রান্ত হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও পরের দিনের জন্যও থাকবে সেই উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা।

কেউ বলবেন না মুসলমান বলে তার অধিকার কম। মানুষ বলেই সে সমান পাবার যোগ্য। মানুষ বলেই যে আধুনিক শিক্ষা পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি জানাতেই পারে। তাকে মাদ্রাসা-মোক্তাব দিয়ে তোয়াজ করে তার সামূহিক সর্বনাশ শুধু তার একার নয়, সমস্ত দেশের। অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা সে কথা বলছেন, কিন্তু বাকিরা? ভবি কি ভুলবার নয়!

রবীন্দ্রনাথ কি এমনটা অনুভব করেই এককালের ছাত্রী অমিতা (খুকু) সেনকে লিখেছিলেন— 'আমরা তো শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছি এখন সমস্যাটা তোদের স্কন্ধে এসে চাপবে।...কোরানের তর্জমা যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে এখন থেকে পড়তে শুরু করে দে।' (রবীন্দ্র পত্রাভিধান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৯)

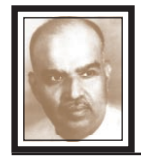

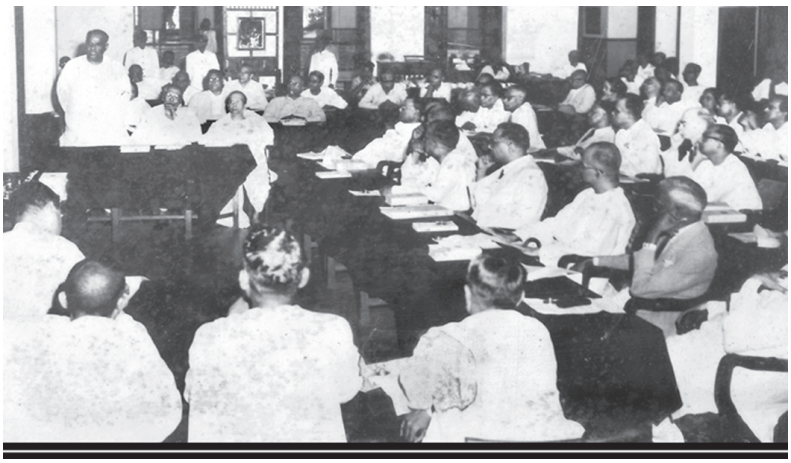

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মিটিংয়ে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। (১৯৪৯)

শিক্ষাবিদ হিসাবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

মন্ত্রিত্ব, রাজনীতি, সেবাকাজ ইত্যাদি বাদ দিলেও স্রেফ কলকাতার মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রয়াত উপাচার্য হিসেবে অন্তত জন্মদিনে একটি হলেও মালা প্রাপ্য হয় তাঁর। হিন্দু বাঙ্গালির জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে, বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'-কে পাকিস্তান থেকে কেটে এনে দিতে গিয়ে, এক দেশ, এক কানুন, এক নিশানের দাবিতে লড়তে গিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' পদবাচ্য হয়ে শাসকের মালা হারিয়েছেন তিনি। তাতে অবশ্য তাঁর বিন্দুমাত্র সম্মান কমেনি কোনোদিনই। যত দিন গিয়েছে, বাঙ্গালি মানসে তিনি ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনে অনেকানেক অমেরুদণ্ডী শিক্ষাবিদের বিপ্রতীপে তিনি এক প্রবল প্রতাপ পুরুষ সিংহ। তোতাপাখির মতো বুলি শেখানো শিক্ষাবিদেরা প্রতিষ্ঠান যে কতখানি অপ্রাসঙ্গিক, তা শ্যামাপ্রসাদকে সামনে রেখে পরিমাপ করে বুঝতে পারি আমরা।

১.

ছাত্রাবস্থায় জেনেছিলাম, অনাথ ছাত্রদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদের বিশেষ স্নেহমমতা ছিল। অকালে বাবাকে হারিয়ে কার্যত অনাথ হয়ে পড়েছিলাম, তাই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকশ্রমে আমার ঠাঁই হলো। সেখানে একটি অনাথ ছাত্রাবাসের নাম 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। সাধারণভাবে বিভিন্ন হোস্টেলের নাম 'ব্রহ্মানন্দ ধাম', 'শিবানন্দ ধাম', 'যোগানন্দ ধাম' ইত্যাদি হতো জানতাম। কিন্তু তার মধ্যে 'অন্য জাতীয় শব্দ' 'হিন্দু মহাসভা ধাম' কীভাবে হয়ে গেল, তার যোগ্য জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন। মিশনের সবচাইতে প্রাচীন আশ্রমিক শ্রী বিধুভূষণ নন্দ আমার যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। জানলাম রহড়া বালকাশ্রমে হিন্দুমহাসভার দানও আছে। ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩৭ জন বালক-নারায়ণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বালকাশ্রম। প্রথম কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৪৫ সালে পুণ্যানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্যামাপ্রসাদ খড়দায় এসেছিলেন কেবল হিন্দু মহাসভার নেতা হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেও। তিনি এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রহড়ায় পরবর্তীকালে অনাথ ছেলেদের কর্মসংস্থামুখী

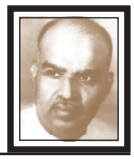

কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনা সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদেরই মানস-ভাবনা। এখানকার ছেলেরা খেলাধুলা, সংগীত, অভিনয়— সব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এমনটাই চেয়েছিলেন, জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী বিধু মাস্টারমশাই।

হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তার আগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। বাংলাদেশে খুলনার সেনহাটি হাইস্কুল ছিল এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান। নানান কারণে শ্যামাপ্রসাদ এই স্কুলটি চালাতে পারছিলেন না। তিনি পুণ্যানন্দজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং এই সমস্ত ছেলেকে পাঠাতে চাইলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজী রাজি হলেন। পরবর্তীকালে ওই ছাত্রদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের টাকা দান করলেন। এই টাকায় তৈরি হয়েছিল 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। ১৯৪৫ সালে শ্যামাপ্রসাদ রহড়ায় এসেছিলেন ছাত্রদের দেখতে। ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন সেনহাটি হাইস্কুলের ছাত্র কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী বা কেষ্ট, যিনি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ বা কেষ্ট মহারাজ, রহড়া বালকাশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তথা বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

কৃষ্ণকমল হিন্দু মহাসভার শাখা কেন্দ্র কলকাতার কর্নওয়ালিশ ট্রিটে ৮নং শিবনারায়ণ দাস লেনের স্কুলে ভরতি হয়েছিলেন। কিছুদিন পর চলে গেলেন হিন্দুমহাসভার খুলনার সেনহাটি হাইস্কুলে। সভার স্কুল উঠে গেল ১৯৪৪ সালের গোড়ায় কলকাতার ১০নং নলিনী সরকার স্ট্রিটে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় স্বামী পুণ্যানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন তিনি। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ বারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'তত্ত্বমসি' পত্রিকায় লিখেছিলেন রহড়া বালকাশ্রমের ইতিহাস। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের পর তাঁর মেজদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ধরে হিন্দুমহাসভা পরিচালিত একটি ছাত্রাবাসে তাঁকে ভরতি করে দেন। জানা যায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততার কারণে আসতে না পারলেও অনাথ ছাত্রদের তিনি খোঁজ খবর নিতেন। অনাথ ছাত্রদের জন্য শ্যামাপ্রসাদের বেদনার্ত হৃদয়, তাঁর সেবাকাজ, আর্তত্রাণের ইতিহাসও বোধহয় হারিয়ে যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে গবেষণা করলে একটি সময় 'সাম্প্রদায়িক পদবাচ্য' হতে হতো। ভয়ে-ভক্তিতে তাই সে পথে বিশেষ কেউ আর যাননি। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর টুকরো টুকরো বহু উদাহরণ জুড়ে আঞ্চলিক ইতিহাস উপাদানের পুঁথি গাঁথা হয়, তবে সামগ্রিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

২.

এবার বলি এক 'বাঘ'-এর ছেলে ছিলেন এক 'সিংহ' (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে 'বাঙ্গলার বাঘ' নামে ডাকা হতো, আর ড. শ্যামাপ্রসাদকে সাংসদ হিসেবে দক্ষতার জন্য ডাকা হতো 'ভারত কেশরী')। 'বাপ কা বেটা'— সবাই বলতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে অভাব অভিযোগ জানানোর একমাত্র পাত্র হচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৫ সালে একটি চিঠিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, 'ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে তুমি দেখিতেছি বাপ কা বেটা হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে পারিবে না।' ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে আসীন হলেন শ্যামাপ্রসাদ। পিতা-পুত্র কোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রসরতাকে প্রবল গতিসম্পন্ন করেছেন এমন উদাহরণ সম্ভবত একটিই— উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তার উত্তরাধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অনেকে মনে করেন, আশুতোষের মৃত্যুর পরই 'উপাচার্য' হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আসলে তা নয়, পিতার মৃত্যুর অন্তত দশ বছর বাদে তিনি উপাচার্য হন এবং উপাচার্য হবার আগে

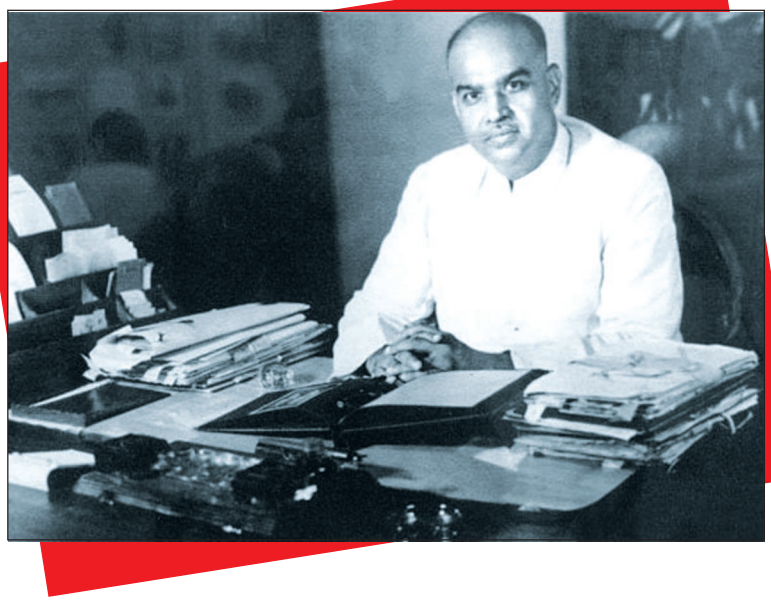

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড শ্যামাপ্রসাদ।

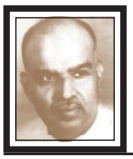

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নানা কাজ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই পদে আসীন হয়েছিলেন।

আশুতোষের প্রয়াণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে উৎকর্ষতার প্রবল অভাব অনুভূত হয়েছিল। একাগ্রতায়, অধ্যবসায়ে, সাধনায় ও প্রজ্ঞায় তা পূরণ করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পাঠক্রমে ও প্রশাসনে পিতা-পুত্র উভয়েই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধন করেছিলেন। আশুতোষের হাতে উপাচার্যের দায়িত্ব ছিল ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। তবে এটা ঠিক, জীবদ্দশায় পিতার শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন পুত্র। সামান্য সময়ের জন্য হলেও পরিচালনার কাজ একসঙ্গে করার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য মনোনীত হন তিনি। তার কয়েকমাস বাদে পিতার মৃত্যু ঘটে। তারপর তিনি সিন্ডিকেটেরও সদস্য হলেন। তখন তার বয়স মোটে ২৩। ১৯৩৪ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি উপাচার্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বর্ণযুগ' বলতে যা বোঝায়, তা হলো তাঁর পিতার ১০ বছর এবং পুত্রের চার বছর মেয়াদি উপাচার্য পদে আসীন হবার কালপর্ব। অনেকের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশলী কার্যকর্তা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ নির্ধারিত সময়ের অনেকদিন আগে এবং পরেও কাজ করে গেছেন, তা De facto উপাচার্য-র মতোই। ১৯৩৪ থেকে হলেন Dejure উপাচার্য। বিদায়ী উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দিও তার নিয়োগে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

উপাচার্য পদ থেকে সরে যাবার পরও ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষাচিন্তার নির্যাস পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বললেন, পরাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত স্তরের মধ্যেই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষে নানা প্রান্তে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার মধ্যে ঐক্যসূত্রটি তুলে আনা দরকার। যখন ১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিচ্ছেন ততদিনে বুঝতে পেরে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কেবল সময়ের অপেক্ষা, আসছেই। তাই উত্থাপন করলেন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ। এইভাবে বাঙ্গলার শিক্ষাবিদ হিসেবে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নিলেন তিনি। বললেন, জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। তিনি কতকগুলি দিক চিহ্নিত করলেন যা পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষাবিদদের কাছে পথনির্দেশ হয়ে উঠলো। যেমন, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া, দেশের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যস্ত ও নবায়িত করা, ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের পদ্ধতি।

ড. শ্যামাপ্রসাদকে ত্রিভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা সওয়াল করতে দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা যা ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষার ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অপরিহার্য। ভাষা সম্পর্কে তিনি গোলমেলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশের ভাষা বলে উপেক্ষাও তিনি করেননি, আবার প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তার মধ্যেকার মণিমাণিক্য সংগ্রহে জোর দিতে বলেছেন, বিশেষত তার মধ্যে অনাবিষ্কৃত উপাদান সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নারী শিক্ষার প্রতি যত্নবান হতে শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের সূচনা করেছিলেন তিনি। আরও যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের, তা হলো কলকাতায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা, ফলিত পদার্থবিদ্যায় communication Engineering পাঠ্যক্রমের আয়োজন, শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন, প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য মিউজিয়াম স্থাপন ইত্যাদি।

শরীরচর্চা যে জাতি গঠনের অন্যতম বিষয়, তা বুঝেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে খেলাধুলার উন্নতিতে তার অনন্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল। ১. ছাত্রদের খেলাধুলা এবং ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা। ২. ঢাকুরিয়া লেকে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি রোইনিং ক্লাব। ৩. তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। ৪. ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা হলো। ইত্যাদি। □

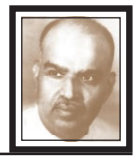

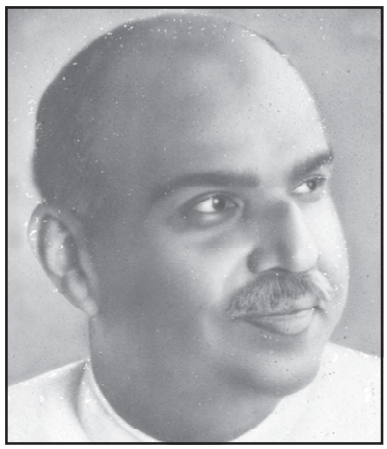

শিবাজীর রাজপতাকা, হিন্দু জাতি-গঠন-ভাবনা এবং স্বামী প্রণবানন্দ ও ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে তার উত্তরাধিকার

কল্যাণ গৌতম

শিবাজীর গুরু ছিলেন রামদাস স্বামী। তাঁর জন্য সাতরা দুর্গ জয় করার পর সজ্জনগড়ে আশ্রম নির্ণাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজী (১৬৭৩)। গুরুকে অঢেল ধন আর ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে শিবাজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন শিবাজী। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী গোটা রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এর জন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন শিবাজী, তৈরি হলো দানপত্র।

পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হলেন, স্বয়ং মারাঠারাজ তথা হিন্দু-অস্মিতা শিবাজী গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম, এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগসুখী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জমিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। এমনই রাজ্যশাসনের দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' ছত্রপতি শিবাজী মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে শিবাজীর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত রাজ্য, এক যোগীরাজ্য। সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বসন দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

২.

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দু-জাতি-গঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দু সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি এবং হিন্দু সমাজের বিপন্নতার বিষয় তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলমান আধিপত্যবাদ বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না, গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে

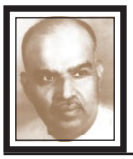

ক্রমাগত সন্ত্রাস সৃষ্টি করছিল, তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে স্বামীজী বললেন, 'ছত্রপতি শিবাজী, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতি-গঠন- আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।' স্বামীজীর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যাকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশা মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। স্বামীজী এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বীরদের। 'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।' ত্রিশূল হস্তে আচার্যদেব মঞ্চে সর্বদা সমাসীন থাকতেন, পরিধানে পীতোজ্জ্বল কৌষেয় বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কণ্ঠে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। তাঁর সাফ কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' আগের দিন ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনেও বললেন, 'আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতো, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মতো স্বধর্ম ও স্বসমাজের রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জাতি-গঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।' বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য হৃদয়ে দুর্দম সংকল্প প্রবাহের জন্য ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে তিনি আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন— 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মারাঠী ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার কনফারেন্স : শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে রয়েছেন ড. মুঞ্জে, মন্মথনাথ মুখার্জী, এস এন ব্যানার্জি, এন কে বসু, সুরেন বসু প্রমুখ।

এরপর দেখা যায় যুগাচার্য হিন্দুদের পাশে সতত অবস্থান করবার এক প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতার সন্ধানে রত হলেন, যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি সঞ্চারিত আছে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন আপন মাল্যে বরণ করে নিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে। নিজের সামূহিক-শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন, বাঙ্গালির জন্য এক শিবাজী-প্রতিম নেতা নির্বাচন করে গেলেন। ওই বছরই শৈবপীঠ বারাণসীতে দুর্গাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বারে ডেকে নিয়ে জাগালেন তার মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। প্রণবানন্দ-জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থে খোলাখুলি লিখেছেন, ''নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়। ...আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ-শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙ্গলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। ...বাঙ্গলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মাধ্যমে এইরূপে আচার্যের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালি জাতির রক্ষার সংকল্প রূপায়িত হইয়াছিল।"

৩.

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। 'মহামৃত্যু কী?' (What is Real Death?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্মবিস্মৃতি' (Forgetfulnss of the 'self')। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া, নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্মবিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক চরম আত্মবিস্মৃতি জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়,

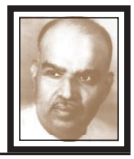

অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পূর্ব থেকে পশ্চিম', আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশে বন্ধন মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস-হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহস মনে রাখবে। বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কী তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তানসন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এরজন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশীতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজনের হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান।

স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে।

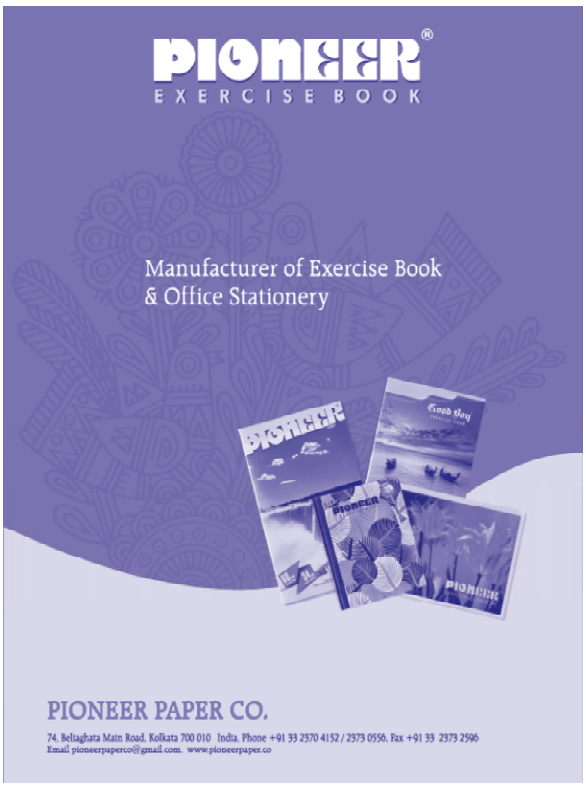

Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.

At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk

Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square

Don't be afraid to give up the good to go for the great.

FOR DETAILS CONTACT : 9831036310 I 9836054628 I 8334051100

Big Diary

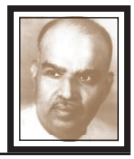

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাজনীতির মুখোশ চিনিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ

সুজিত রায়

‘‘জনজীবনে তিনি কখনো নিজের অন্তরতম বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করতে ভয় পাননি। নীরবতার মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুরতম মিথ্যাকথাও বলা হয়। যখন বিশাল অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে তখন ‘সত্য একদিন উদঘাটিত হবেই’ এই আশা করে নীরব থাকা অপরাধ।’’

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তৎকালীন ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণন তাঁর শোকবার্তায় এই কথাগুলি বলে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা খুব স্পষ্ট। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সত্য প্রকাশের স্বার্থে শ্যামাপ্রসাদ কখনও ভয় পাননি। নিজস্ব বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াননি এবং ঘৃণা করেছেন মৌনতাকে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, মৌনতা সত্যের প্রকাশে বাধাই সৃষ্টি করে। তাতে সমাজ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাধাকৃষ্ণনের এই উপলব্ধিই প্রমাণ করে, সামগ্রিকভাবে ভারত এবং ভারতীয়দের স্বার্থে অতি স্বল্পসময়ের রাজনৈতিক জীবনে শ্যামাপ্রসাদ যে অবদান রেখে গেছেন তার সবটাই সত্যের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার রাজনীতি করেননি তিনি। আর তা করেননি বলেই হয়তো তথাকথিত ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে শ্যামাপ্রসাদ হলেন, ‘সাম্প্রদায়িক’, ‘সুযোগসন্ধানী’ এবং ‘হিন্দুধর্মের আরকে সিক্ত এক হিন্দু’। ভারতীয় নন। আজ থেকে ৮৩ বছর আগে রাজনীতির রসায়নগারে সৃষ্ট এই আজগুবি অভিযোগগুলি আজও বহাল রেখেছে ওইসব রাজনৈতিক দলগুলি যারা শুধু ভোটের অঙ্কে রাজনীতির ফায়দা লুটতে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছে নিজেদের সুবিধামতো। ভারতবর্ষের সার্বিক স্বার্থে নয়। করেছে বলেই আজ গোটা দেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ওষ্ঠাগত। মুখে না স্বীকার করলেও ওইসব তথাকথিত সেকুলার রাজনীতিবিদরা জনান্তিকে মেনে নেন, শ্যামাপ্রসাদকে বাঁচিয়ে রাখলে ভারতীয়ত্ব বাঁচত। ঐতিহ্য বাঁচত। পরম্পরা বাঁচত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ‘দুধেল গাই’ আখ্যা দিয়ে ওই গাইয়ের খুরের চাট খাওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে হতো না। আর এখানেই ভারতীয় রাজনীতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদার্পণের সার্থকতা।

শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার কোরক থেকেই জন্ম দিয়েছিলেন

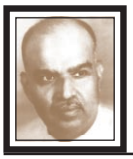

ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক দলের। কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন ঘরানা যা ছিল সে আমলের গতানুগতিক রাজনৈতিক মূল স্রোতের এক পরিপন্থী স্রোত, যার ভিত্তি ছিল সত্যতা, সততা ও সহিষ্ণুতা। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিকে চিনিয়ে ছিলেন, হিন্দুত্ব কোনো ধর্মান্ধতা নয়। হিন্দুত্ব হলো ভারতীয়ত্বের বিশ্বাস। বহু বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে হিন্দু ধর্মের বিশ্বমানবতার যে

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনায় দিল্লিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৯)।

নির্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রাজনীতির দরবারে সেটাই প্রতিষ্ঠিত করতে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সংখ্যালঘুর তুষ্টিকরণ নয়। সংখ্যালঘু ভোট বাঁচাতে সংখ্যাগুরুদের অপমান করা নয়। এ ধরনের পদক্ষেপই হলো ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা।

জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের সেকুলারিজম ছিল সংখ্যালঘুর তুষ্টিকরণ এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুদের নানাভাবে বঞ্চিত করা। কারণ হিন্দুরা সাধারণভাবে প্রতিবাদী নন। তাঁরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও পরম্পরাবাহী ধৈর্য ও স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। আর যখনই কোনো হিন্দু (ধর্মীয়ভাবে নয়, ঐতিহ্যগত ভাবে) প্রতিবাদ করেন তখনই তাঁর গায়ে কংগ্রেস বা কমিউনিস্টরা সেঁটে দেন কমুনালের পোস্টার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং হিন্দু মহাসভাকে চিরকাল 'সাম্প্রদায়িক' দল বলে অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রমুখ হিন্দু নেতৃত্বকে তাই কখনও জাতীয়তাবাদী নেতা বলে স্বীকার করে নেয়নি বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। অথচ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এদের মতো হিন্দুদের কৃচ্ছসাধনের প্রমাণ আছে ভুরি ভুরি।

শ্যামাপ্রসাদ মূলত ছাত্র রাজনীতি থেকে পরিপূর্ণ রাজনীতির জগতে প্রবেশ করার সময়ও এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়ার পর যে তিনিও 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত হবেন সেটা জেনেশুনেই তিনি জাতীয়তাবাদী হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন এই যুক্তিতেই যে কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নুইয়ে ভারতীয়ত্বকে ছোটো করে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেওয়া হয়নি। তথাকথিত সেকুলার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর চক্রান্তে তাঁকে অকালে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু অতি স্বল্প সময়ের রাজনৈতিক জীবনে তিনি বারেবারে প্রমাণ করেছেন, বাস্তবতই তাঁর চরিত্রে কখনও কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা মনোভাব প্রশ্রয় পায়নি। তিনি একাধারে যেমন হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গর্জে উছেছেন, ঠিক তেমনভাবেই তিনি গর্জে উঠেছেন মুসলমান জনসমাজের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদেও। রাজনৈতিক ভণ্ডামিকে তিনি আক্ষরিক অর্থে ঘৃণা করতেন। তাই মুখোশ খুলে ভণ্ড দেশপ্রেমী মানবপ্রেমীদের চিনিয়ে দিতে তিনি কখনও পিছপাও হননি।

ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর এই পদক্ষেপ বহু মানুষকে নতুনভাবে চিনতে শিখিয়ে দিল সেকুলারবাদীদের নাটক আর সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত স্বরূপ

শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে। পরে নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হন। পরে পূর্ণ সময়ের জন্য রাজনীতিতে থেকে গিয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার সদস্য হিসেবে। সেখান থেকেই তাঁরই প্রচেষ্টায় জন্ম নিয়েছিল জনসঙ্ঘ যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে পরিণত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের এই বারবার দল বদলকে কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব 'সুযোগসন্ধানী রাজনীতি' বলে অপবাদ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এঁরা কখনও তলিয়ে দেখেননি যে, তাঁর এই দলবদলের পিছনে নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল, কারণ তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও সংসদীয় রাজনীতির পরাকাষ্ঠায় বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ। তিনি কখনওই গান্ধীর মতো লোক খেপানো রাজনীতি করেননি। কারণ তিনি জানতেন, বিশ্বের সর্বত্রই গুরুত্ব পায় সংসদীয় রাজনীতি। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি। মানুষকে ভুল পথে চালিত করে মিছিলসর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে কখনও সংসদীয় রাজনীতির ফল লাভ হয়

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত (বনগাঁ) পরিদর্শনে শ্যামাপ্রসাদ, সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি (১৯৫০)।

না। তাই বিরোধীরা পথে ঘাটে সাধারণের অসুবিধা করে সভা সমিতি করলেও, শ্যামাপ্রসাদ কখনও ওই হাঁকডাক সর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে বাজিমাত করার চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি মানতেন, দেশের মঙ্গলের দায়িত্ব সংসদে, সংসদীয় রীতিনীতির। তাই তিনি সংসদ কাঁপিয়েছেন তাঁর ব্যারিটোন কণ্ঠের বক্তৃতায়। যুক্তিসম্মতভাবে নীতিক রাজনীতির সমালোচনা করেছেন এবং সংসদের ইতিহাস রেখে গেছেন তাঁর মহামূল্যবান সব ভাষণ যা আজও ভারতীয় রাজনীতির স্বরূপ চিনেত সাহায্য করে।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভালোবাসার শিক্ষাজগৎ ছেড়ে পূর্ণ সময়ের রাজনীতিতে এসেছিলেন মূলত তিনটি কারণে। প্রথম কারণটি ছিল হিন্দু নিপীড়নের প্রতিবাদে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া। দ্বিতীয় কারণটি ছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার কার্যধারার পালটা কর্ণধারা লাগু করা এবং তৃতীয় কারণটি ছিল কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধী বনাম সুভাষ বনাম জওহরলাল নেহরুর যে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী স্বরূপ তাকে প্রকাশ করে দেওয়া।

প্রকৃতপক্ষে মূলত বাঙ্গলায় মুসলিম লিগের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ ক্রমাগত হিন্দুদের কোণঠাসা করে ফেলছিল। ১৯৩৭ সালে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। সে সময়ের কথা শ্যামাপ্রসাদ খোলা মনে লিখে গিয়েছেন তাঁর ডায়েরিতে। তিনি লিখেছেন : 'সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে কার্যত হিন্দুদের পথ রুদ্ধ করা, হিন্দু দেবমন্দির অপবিত্র করা, মুসলমানদের সপক্ষে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব, দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া ও হিন্দু মহিলাদের উপর আক্রমণ' চরমে উঠেছিল। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব, পরবর্তীকালে লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছিলেন : গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার হিন্দুরা সব রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে...যদি না মুসলমানরা স্বেচ্ছায় তাদের সেই ক্ষমতা দেয়, যার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ... বাঙ্গলার হিন্দুরা হয়ে যাবে এক পাকাপাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, চিরকালের জন্য থেকে যাবে ক্ষমতার বাইরে। তাদের শুধু ক্ষমতা থাকবে আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠানোর।'

সরকারিভাবে ফজলুল হক ছাড়া বাকি কোনো মুসলমান নেতাই চাইতেন না, হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে প্রশাসনিক সুরক্ষা পাক। কিন্তু কুচক্রী নেতা সোহরাবর্দি ও তাঁর দুই সাকরেদ শাহবুদ্দিন ও নাজিমুদ্দিনই ছড়ি ঘোরাবার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন। ফজলুল হক ভালোমানুষ হলেও এদের জব্দ করার সাহস তাঁর ছিল না। ফলত আইনসভা চলত মুসলমানদের পক্ষে আইন পাশ করানোর জন্য যা মূলত হিন্দুদের একঘরে করে তোলার এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি— সবেতেই অগ্রাধিকার ছিল মুসলমানদের। ইংরেজ প্রশাসকরাও চাইছিলেন হিন্দু-মুসলমান সংঘাত তীব্র হোক। তাতে তাদের রাজনৈতিক

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

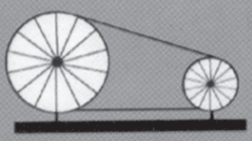

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

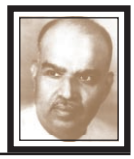

ফয়দা হবে। ফলত দেখা গেল, সরকারি ক্ষেত্রে যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপ কাঠিকে শিকেয় তুলে একতরফাভাবে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ শুরু হলো। (পাঠকবর্গ লক্ষ্য করবেন, অতি সম্প্রতি গত ১৮ জুন রাজ্য সরকার পুলিশ নিয়োগে নোটিফিকেশন জারি করেছে। মেনো নং PRR/RM/SI (WBP1/12 (PT) Web-1523। ওবিসিও ক্যাটাগরিতে যেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হিন্দুদের চেয়ে তাই রাজ্য পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগে প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওবিসি-এ (ওবিসি-এ) ক্যাটাগরির তালিকা প্রকাশে। তাতে দেখা যাচ্ছে মোট ৩৭ জন সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত যুবকের মধ্যে ৩৫ জনই মুসলমান। হিন্দু আছ ২ জন।) ১৯৩৭ এবং পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতাই বাঙ্গলার হিন্দুদের অস্তিত্ব বিনাশে মেতে উঠেছিল। কলকাতা পুরসভাও চলে যাচ্ছিল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। (যেমনটি আজ হতে চলেছে মুসলমান মেয়র ও অধিক পরিমাণে মুসলমান কমিশনার পদে মুসলমানদের নির্বাচন করে)।

ফলত গোটা বাঙ্গলা জুড়েই তৈরি হচ্ছিল এক অসহিষ্ণু রাজনৈতিক পরিবেশ।

বিপদটা আঁচ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন, হিন্দুদের বাঁচাতে গেলে তথাকথিত সেকুলারদের একঘরে করতে হবে। দরকারে কৃষক প্রজা পার্টির হিন্দু নেতাদেরও। এবং যে কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধু হিসেবে পাশে পেলেন মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে। যিনি হিন্দু মহাসভার একচ্ছত্র সর্বজনসম্মত সর্বোচ্চ নেতা। হিন্দু মহাসভা ছিল একটি সামাজিক-রাজনৈতিক দল। উদ্দেশ্য, হিন্দুসমাজের স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়ন। এই দলের লক্ষ্যই ছিল গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা।

শ্যামাপ্রসাদের এই রাজনৈতিক ধীশক্তিই পরবর্তীকালে দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির যুগসন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙ্গলার হিন্দুদের অস্তিত্বকে রক্ষা করেছিল। প্রাণে বেঁচেছিল হিন্দুরা। হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমি ছিনিয়ে আনা হয়েছিল মুসলানদের করাল গ্রাস থেকে। এ ইতিহাস সবার জানা যে, জিন্না চেয়েছিল পুরো বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক। কারণ পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে তখনও মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। গান্ধীজী-জওহরলালরা রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রশাসক মাউন্ট ব্যাটেনও একপায়ে খাড়া। প্রমাদ গুনলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি দাবি তুললেন, বঙ্গপ্রদেশের পূর্বাংশ পাকিস্তান নিক। পশ্চিমাংশ ভারতেই থাকবে। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কৃষক প্রজা পার্টি সব হাঁ হাঁ করে উঠল। দেশ তো ভাগ হলো। এবার কি তাহলে বাঙ্গলাও ভাগ হবে? তা তো হতে পারে না। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, বাঙ্গলা পাকিস্তানে গেলে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যাবে পাক-প্রশাসনের হাতে। সেটা হতে পারে না। তার চেয়ে জনবিনিময় হোক পাক-ভারতের মধ্যে। মুসলমানরা চাইলে পূর্ববঙ্গে চলে যাক। হিন্দুদের বাসভূমি হবে পশ্চিমবঙ্গ।

কৃষক প্রজাপার্টি এবং মুসলিম লিগ পালটা দাঁও মারার চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, বাঙ্গলা পকিস্তানেও যাবে না, ভারতেও থাকবে না। বাঙ্গলা হবে স্বাধীন রাজ্য। আপাতত। পরে চিন্তাভাবনা করে দেখা যাবে, বাঙ্গলা কার সঙ্গে হাত মেলাবে। শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি জানতেন, সোহরাবর্দি যেখানে আছে সেখানে বাঙ্গলা জুড়বে পাকিস্তানের সঙ্গেই। আর তা মানেই পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাবে হিন্দু অচিরেই। সেটা হতে দেওয়া যাবে না। তিনি আওয়াজ তুললেন, পশ্চিমবঙ্গ কোনো মতেই পাকিস্তানের হাতে দেওয়া যাবে না। সেদিন যদি শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে বাঙ্গলার হিন্দুরা সমর্থন না জানাতো তাহলে আজ আমরা হিন্দুরা মুসলমান হয়ে তিন ওয়াক্ত নমাজ পড়তাম আর জঙ্গি পাকিস্তানিদের মতো ভারতকে আক্রমণ করতাম। এটা হতো ভবিতব্য। শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলাকে বাঁচিয়েছেন। হিন্দুদের বাঁচিয়েছেন। এর চেয়ে বড়ো অবদান আর কী হতে পারে?

শ্যামাপ্রসাদের শেষ অবদান ছিল— প্রত্যক্ষভাবে জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীর নীতির বিরোধিতা করে 'এক দেশ এক আইন এক নিশান'-এর দাবিতে সোচ্চার হয়ে মুসলমান রাজ্য পাকপন্থী কাশ্মীরকে 'সুযোরানি' করে রাখার কেন্দ্রীয় তথা কংগ্রেসি নীতির বিরোধিতা করা। শুধু সংসদে এই বিরোধিতা করাই নয়, একক বিক্রমে তিনি সমস্ত বাধা ঠেলে পৌঁছে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারপর ভারতবাসী আর শ্যামাপ্রসাদকে ফিরে পায়নি। কাশ্মীরেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সব জবাব আজও মেলেনি। তবে অনেক দুঃখের মধ্যেও এটাই গর্বের যে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সক্রিয়তায় কাশ্মীরের সুয়োরানি তকমা কেড়ে নিয়ে কাশ্মীরকেও ফিরিয়ে এনেছেন ভারতের মূলস্রোতে। স্বপ্নপূরণ হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের।

শ্যামাপ্রসাদকে কমিউনিস্টরা যে নামেই ডাকুক, কংগ্রেসিরা যতই অপবাদ দিন, সমাজতান্ত্রিকরা যতই বলুন না কেন শ্যামাপ্রসাদ আসলে এক ধুরন্ধর সুবিধাবাদী ব্যক্তি, ইতিহাস তার বিচারের রায় বলে দিয়েছে। ভারতবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে— ভারতমাতার প্রকৃত সন্তান শ্যামাপ্রসাদই চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত হিন্দুত্বের মহিমায় গোটা ভারতবর্ষকে বাঁধতে। ধর্ম নয়, জাতি নয়। হিন্দুত্বের জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে, ভারতবাসীকে। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ছিল এক পথপ্রদর্শকের। তিনি বেঁচে থাকলে ভারত পৌঁছতে পারত এক নয়া উচ্চতায়। তাঁর অবর্তমানে আজ প্রয়োজন তাঁর আদর্শ ও অবদানকে মূলধন করে নতুন ভারত গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হওয়া।□

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO 14001 : OHSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

* * *

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.com
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.com

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.com

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.com

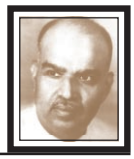

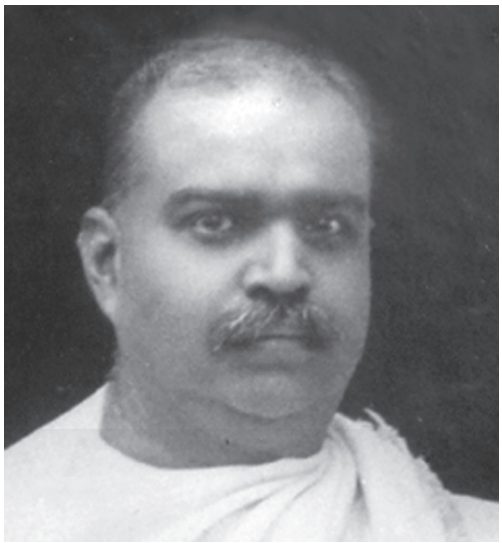

মানব দরদি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

প্রণব দত্ত মজুমদার

আমরা যদি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সমস্ত জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো যে তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষের কাজে উৎসর্গীকৃত। তিনি ছিলেন মানব দরদি একজন মহামানব। সেটা শিক্ষাবিদ হিসেবেই হোক বা রাজনীতিবিদ হিসেবে। ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। নিয়তি যেন তাঁকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনেছিল। তিনি চেয়েছিলেন পিতা স্যার আশুতোষের মতোই শিক্ষাবিদ হিসেবেই শিক্ষার প্রসার সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তুলবেন। দেশবাসীকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে পারলে নাকউঁচু ইংরেজদের সঙ্গে সমান টক্কর দিতে পারলে ওরা আমাদের দেশবাসীকে বেশি দিন গোলাম বানিয়ে রাখতে পারবে না। তখন 'Constitutional means'-এর মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে তাঁকে কীভাবে রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনেছিল সেটা একটু বলে নেওয়া দরকার, আর তার মধ্যে তাঁর মানবদরদি ভাবমূর্তিটির পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

অত্যন্ত মেধাবী ড. শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ ভারতের খ্যাতির চূড়ায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৩ বছর বয়সে তিনি উপাচার্য! একরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যাই হোক, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে আরম্ভ করে তখন পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য নানারকম সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করেছিল এদেশের মানুষের হাতে স্বায়ত্বশাসনের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের বশে রেখে তাদের রাজত্ব চালিয়ে যাবে। এই কারণে তারা দুটি কানুন তৈরি করেছিল। একটি হলো 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড- ১৯৩২', অপরটি হলো 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫'। এই দুই কানুনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে ভারতের এগারোটি ব্রিটিশশাসিত প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙ্গলায় তখন দুটি মুসলমান পার্টি। জিন্নার সর্বভারতীয় দল মুসলিম লিগ এবং ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি মিলে কোয়ালিশন সরকার তৈরি হয় ফজলুল হকের নেতৃত্বে। ড. শ্যামাপ্রস মুখার্জি 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কনস্টিটিয়েন্সি' থেকে বাঙ্গলার আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন ওইরকম একটি কনস্টিটিয়েন্সি তৈরি করা হয়েছিল রাজ্যের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় প্রাদেশিক আইনসভায় তুলে ধরার জন্য।

ইংরেজ আমলে বাঙ্গলায় ইসলামি শাসন শুরু হতেই বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বাঙ্গলায় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা পেয়ে মুসলিম লিগ ওদের প্রিয় অ্যাজেন্ডা ভারতভূমিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ তৈরির ব্যাপারে ঘুঁটি সাজাতে আরম্ভ করে দিল। তারা Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কানুনটিকে ভালোভাবে প্রয়োগ করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সর্বত্র মুসলমানদের নিয়োগ করে হিন্দুদের প্রাধান্য কমাতে শুরু করলো। তখন বাঙ্গলায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ আর হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ শতাংশ। কাজেই ওরা রাজনৈতিক প্রতিনিধিই হোক বা কর্মক্ষেত্রই হোক সর্বত্রই এক অনুপাতে নিয়োগ আরম্ভ করলো। বাঙ্গলায় উপযুক্ত যোগ্যতার মুসলমান পাওয়া না গেলে অন্য প্রদেশ থেকে মুসলমানদের এনে নিয়োগ করতে আরম্ভ করলো। উপযুক্ত হিন্দু থাকা সত্ত্বেও অনুপযুক্ত মুসলমানদের নিয়োগ করা হতে থাকলো। এই ভাবে হিন্দুদের কোণঠাসা করে বাঙ্গলায় ওরা নিজেদের ভিতকে মজবুত করতে আরম্ভ করলো। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশের পরোক্ষ সমর্থনে মুসলিম লিগ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লিগ সদস্যরা পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে, হিন্দুদের মঠ মন্দির অপবিত্র করে, হিন্দু মেয়ে বউদের শ্লীলতাহানি করে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রাদেশিক আইনসভার একজন সদস্য হিসেবে

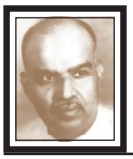

এসব ঘটনা শুনে ড. শ্যামাপ্রসাদ চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর সাধ্যমতো অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় ছোটাছুটি করে লাঞ্ছিত হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি লক্ষ্য করলেন কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট কেউ এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না। উভয় পার্টিই মুসমানদের তোয়াজ করে চলছে। প্রাদেশিক সভায় যোগদানের পরে এই স্বল্প পরিসরেই ড. শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেন কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের এই মুসলমান তোষণের রাজনীতি বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে, আর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান না করে শুধু শিক্ষাবিদ হিসেবে সীমিত ক্ষমতায় বেশি কিছু করা সম্ভবও নয়। এরকমই এক অস্থির মানসিক পর্যায়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রচেষ্টায় হিন্দুমহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি বীর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয় শ্যামাপ্রসাদের। বীর সাভারকরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, হিন্দু মহাসভার দর্শন কার্যক্রম ইত্যাদি অনুধাবন করে তাঁর মনে হলো এই রাজনৈতিক দলটিতে যোগদান করলে হিন্দুদের, সর্বোপরি দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ তিনি করতে পারবেন। অবশেষে ড. শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগদান করলেন। ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। বীর সাভারকরের অসুস্থতার কারণে ওই বছরই তিনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ভাবে মানব সেবার তাগিদে, দেশের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষায় শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করলেন।

এদিকে ১৯৪০ সালে জিন্না মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের মধ্যে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের প্রস্তাব পাশ করালেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের এই দাবিকে সমর্থন করেছিল এবং এই দাবির সপক্ষে জোরদার প্রচারও করেছিল। যাইহোক, ১৯৪১ সালে বাঙ্গলার রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় জিন্নার সঙ্গে ফজলুল হকের তীব্র মতভেদের কারণে। জিন্না চেয়েছিলেন ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির সঙ্গে গাঁটছড়া ভেঙে দিয়ে ইংরেজের সহায়তায় মুসলিম লিগ একাই সরকার গঠন করবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে হিন্দু মহাসভার গাটছড়া বেঁধে আরও কিছু প্রয়োজনীয় সদস্য জোগাড় করে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গড়ে ফেলেন 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন' গভর্নমেন্ট। এইভাবে তিনি কট্টরপন্থী জিন্নাকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে গুরুত্বহীন করতে চেয়েছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক কট্টরপন্থী মুসলমান ছিলেন না। তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী করেছিলেন। লোকে এই সরকারকে 'শ্যামা-হক' সরকার বলতো।

১৯৪২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়। মেদিনীপুরে সেই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর জেলার একাংশে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ হয়। বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে সেখানে গঠিত হয় 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'। ব্রিটিশ সরকারের সম্মানে ঘা লাগায় ব্রিটিশ সরকার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। মেদিনীপুরের জনসাধরণের উপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। বহু লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহী গ্রামগুলির উপর বিপুল পরিমাণ জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, শুধুমাত্র হিন্দুদের উপরই জরিমানা চাপানো হয়েছিল, কারণ ওই সময় মুসলিম লিগ ইংরেজ বিরোধিতা করেনি। তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ইংরেজ গভর্নর জন হারবার্টকে তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা তো মুসলমান শাসকদের মতো হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়েছে। Political Sufferers Relief Committee গঠন করে মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ; সেখানে তিনি কোনো রাজনৈতিক রং দেখেননি। ওই সময়ই ১৯৪২ সালের দুর্গাপূজার সময় আরেক বিপদ মেদিনীপুরবাসীর জীবনে নেমে এসেছিল। প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও তীব্র সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস মেদিনীপুরের উপর আছড়ে পড়ে। জোড়া বিপদে মেদিনীপুরবাসীর জীবনে নরক যন্ত্রণা নেমে আসে। ইংরেজ সরকার সারাদেশের কাছে এই খবর চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওরা চাইছিল বিদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীরা মরে মরুক, কেউ যেন এদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। বেসরকারি সূত্রে এই খবর জানতে পেরে শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুরে ছুটে যান। ইংরেজের এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা দেশবাসীর গোচরে আনেন। Bengal Cyclone Relief Committee তৈরি করে দুর্গত মানুষদের ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার যুদ্ধের অজুহাতে মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব করে পেটোয়া আমলাদের সাহায্যে সরকার চালাচ্ছিল এবং মানুষের উপর অমানবিক দমনপীড়ন চালাচ্ছিল। শ্যামাপ্রসাদ দেখলেন এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুর্গত মানুষদের জন্য সেভাবে কিছু করতে পারছেন না। এই যন্ত্রণায় তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর।

কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা তাঁকে দাবিয়ে রাখার জন্য তার উপর সাম্প্রদায়িকতার তকমা সেঁটে দিয়েছিল, কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার নেতা হলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন অসাম্প্রদায়িক এবং মানবদরদি মানুষ। মানবসেবার কাজে তিনি ধর্ম বা রাজনীতির রং দেখতেন না। ফজলুল হকের পার্টি কৃষক প্রজা পার্টির কাছে ড. শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দল হিন্দু মহাসভার

বনগাঁয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থী শিবিরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৬)।

গ্রহণযোগ্যতা সেই সত্যকেই প্রমাণ করে না কি? এই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করলে তাঁর মানবদরদি রূপটি অনুধাবন করা যাবে। এটি ১৯৪২ সালের ঘটনা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী তখন গুরুতর অসুস্থ। স্ত্রী চিকিৎসার কারণে কবিকে কাবুলিওয়লা ও মাড়োয়ারি মহাজনদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার করতে হয়েছিল। কবিও অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই টাকা শোধ করতে পারছিলেন না। ধারের টাকা শোধ করতে না পারার কারণে পাওনাদারেরা কবিকে জেলে পাঠাবে প্রায় সেরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেছিল। সেই খবর কোনোভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদের কানে আসে। তিনি কবির একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। খবর পেয়েই তিনি কবির সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং টাকাপয়সা জোগাড় করে কবিকে ঋণমুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, অসুস্থ কবি ও তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে জলবায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য পুনোরুদ্ধার করার জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মধুপুরে তাঁদের পারিবারিক গেস্টহাউস 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউস'-এ কবিকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কবি এক দীর্ঘ পত্র লিখে ড. শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন। সেই পত্রটি পড়লে বোঝা যাবে কবি নজরুল কী ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন শ্যামাপ্রসাদকে। ড. শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে লেখা যে কোনো বইয়ে এই পত্রটি দেখতে পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সাল নাগাদ কাজী নজরুল যখন নার্ভের অসুখ জনিত কারণে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন তখনো কবির চিকিৎসার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি কবির চিকিৎসার খরচ চালাবার জন্য তৈরি করেছিলেন 'নজরুল ট্রিটমেন্ট সোসাইটি'। তিনি বাগাড়ম্বর না করে সত্যিকারের সেবামূলক মনোভাব নিয়ে মানুষের উপকারের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে সমর্পণ করে দিতেন সত্যিকারের মানবদরদি মানুষ হিসেবে, সেখানে কোনো ভড়ংবাজি ছিল না।

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ভারতের প্রাদেশিক আইনসভার যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে বাঙ্গলায় জিন্নার মুসলিম লিগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছিল সুরাবর্দির নেতৃত্বে। বিশ্বযুদ্ধ শেষে নানারকম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপের কারণে ইংরেজ একটি সমাধান সূত্র বার করে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার মনস্থ করল। জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ডিত করে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় রইলেন। কমিউনিস্টরা ছাড়া দেশের আর কোনো রাজনৈতিক দলই জিন্নার এই দাবিকে মানছেন না। এইবার জিন্না ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্তিম চালটি দিলেন। তিনি আল্টিমেটাম দিলেন ৪৬ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে তার দাবির পক্ষে সমর্থন পাওয়া না গেলে ১৬ আগস্ট থেকে মুসলিম লিগ সদস্যরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করবে

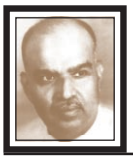

পাকিস্তান আদায়ের জন্য। এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন আসলে ছিল চতুর শব্দবন্ধের আড়ালে থাকা ইসলাম বর্ণিত 'জিহাদ', যার মাধ্যমে অমুসলমান (কাফের)-দের মেরে কেটে ধ্বংস করে ইসলামের রাজত্ব 'দার-উল- ইসলাম' কায়েম করা হয়। ১৫ আগস্টের মধ্যে জিন্নার দাবির সমর্থন না মেলায় ১৬ আগস্ট সকালের নামাজের পর সারা কলিকাতা শহর জুড়ে মুসলমানরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিন দিন ধরে হিন্দুদের মেরে কেটে, তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু নারীদের শ্লীলতাহানি করে, হিন্দু মন্দির অপবিত্র করে কলকাতাকে তছনছ করে দিয়েছিল মুসলিম জিহদিরা। প্রায় পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল, জখন হয়েছিল পনেরো হাজারের মতো। ইতিহাসে এই ঘটনা দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এতে প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ সুরাবর্দি সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন কিন্তু বাঙ্গলার তফশিলি নেত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কূটকৌশল ও সহায়তায় সুরাবর্দি সরকার বেঁচে যায়। কলিকাতায় দাঙ্গা করে অভিষ্ট সিদ্ধ হলো না দেখে মুসলিম লিগ আবার জিহাদ করলো। এবার করলো ওই বছরই ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে চলেছিল তাদের নারকীয় কাজ। গ্রামের পর গ্রাম হিন্দু হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙচুর, হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, জোর করে হিন্দু কুমারী মেয়েদের মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, হিন্দুদের জোর করে গোমাংস ভক্ষণ করানো ইত্যাদি যতরকম বর্বরোচিত কাজ হতে পারে সব তারা করেছিল। নোয়াখালিতে জিহাদিরা যেটা উল্লেখযোগ্য ভাবে করেছিল তা হলো 'হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো মরো' নীতি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছিল। এক কথায় মুসলমানরা নোয়াখালির হিন্দুদের নরকে নিক্ষেপ করেছিল। ইতিহাসে এই ঘটনা Noakhali Genocide নামে পরিচিত হয়ে আছে। ইংরেজ শাসকের সহযোগিতায় এই সমস্ত খবর চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, কিন্তু এই খবর ড. শ্যামাপ্রসাদের কানে পৌঁছুতেই তিনি ছুটে যান নোয়াখালিতে। তিনি প্রাদেশিক আইনসভায় হিন্দু মহাসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। একটি ছোটো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতা নিয়েই তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সারাদেশের লোকের সামনে মুসলিম লিগের নৃশংসতা তুলে ধরলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তাদের মনোবল বাড়াবার জন্য। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে যা যা করা সম্ভব করলেন। আর একটি যে কাজ শ্যামাপ্রসাদ করেছিলেন তা তখনকার বিচারে এককথায় অভূতপূর্ব। তা ছোটো এক রাজনৈতিক দলের নেতার পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ। আগেই বলেছি নোয়াখালিতে হাজার হাজার হিন্দুকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ সেই বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিত লোকেদের পুনরায় সসম্মানে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার দুঃসাধ্য কাজটি করেছিলেন। তখনকার দিনে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে এই কাজটি করা খুব সহজ ছিল না। তিনি হিন্দুধর্মের যত বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা বড়ো বড়ো যত ধর্মীয়

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫২)

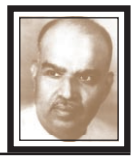

গুরু আছেন যেমন— রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ, ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ, বাকলা সমাজ, বিক্রমপুর সমাজ, কাশীর পণ্ডিত সমাজ, কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য, গোবর্ধন মঠ (পুরী)-এর স্বামী যোগেশ্বরানন্দ তীর্থ মহারাজদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন এইসব হতভাগ্য হিন্দু, যারা প্রাণের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তাদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা যায় তার ধর্মীয় বিধান দেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের এই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে হিন্দু সমাজের ধর্মবেত্তারা অনুমোদন দান করে ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের আহ্বান ও বিধান বুকলেট আকারে প্রচার করেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। ড. শ্যামাপ্রসাদ এ ব্যাপারে জোরালো বিবৃতি দিয়েছিলেন— ''আমাদের বহু সহস্র ভ্রাতা ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাহারা হিন্দু ছিলেন, তাহারা এখনো হিন্দু এবং তাহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে— কোনো ব্যক্তিই এরূপ কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না। যখনই কোনো মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারীকে উদ্ধার করা হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে''। এই ভাবে হাজার হাজার ধর্মান্তরিত হিন্দুকে পুনরায় সসম্মানে স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে তাদের গ্লানিমুক্ত করেছিলেন মানবদরদি ড. শ্যামাপ্রসাদ। এ কথা আমরা কতজন জানি? প্রকৃত মানবদরদি না হলে, মানুষের যন্ত্রণা নিজের হৃদয়ে অনুভব না করলে এধরনের কাজ করা কি সম্ভব?

মুসলিম লিগের জেহাদি রূপের কাছে অবশেষে গান্ধীজী ও তাঁর কংগ্রেস নতজানু হলো। ঠিক হলো ভারতবর্ষকে ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান গঠন করে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। বাঙ্গলায় তখন যেহেতু মুসলমানরা মেজরিটি (প্রায় ৫৫ শতাংশ) তাই ঠিক হয়েছিল সমগ্র বাঙ্গলা পাকিস্তানের অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান হবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করলেন মুসলমান শাসনের অধীনে থাকলে হিন্দুদের জান মান কিছুই থাকবে না। তাই তিনি ৪৫ শতাংশ বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ডের জন্য বাঙ্গলা ভাগ করে তা ভারতভুক্ত করার তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। তখন বাঙ্গলার সব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন— ড. মেঘনাদ সাহা, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, লর্ড সিনহা প্রমুখ ড. শ্যামাপ্রসাদের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ৪৬-এর দাঙ্গা দেখার পরে বাঙ্গলার কংগ্রেসের বেশিরভাগ অংশই ড. শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর তীব্র আন্দোলনের ফলেই অবশেষে বাঙ্গলা ভাগ করে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হলো ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাঙ্গলার অ্যামেম্বিলিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই কাজটি করে না দিয়ে গেলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম? ইসলামিক বাংলাদেশে থেকে মুসলমানের তরবারির তলায় প্রতি মুহূর্তে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতাম। যিনি আমাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার, খোলা হাওয়ায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু লড়াই করে আদায় করে দিয়ে গেলেন, আমরা অকৃতজ্ঞ হিন্দু বাঙ্গালিরা কত সহজেই সেই মহাপুরুষটিকে ভুলে গেলাম! এ মহা পাপ।

তথ্য সূত্র :

(১) The Life and Times of Dr. Shyama Prasad Mukherjee A Complete Biography by Sri Tathagata Roy.

(২) 1946 The Great Calcutta Killings And Noakhali Genocide by Dr. Dinesh Ch. Sinha, Asoke Dasgupta, Ashish Chowdhury.

(৩) বাঙ্গালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ, কবিশেখর কালিদাস রায়।

(৫) ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও ড. আম্বেদকর, শ্রী বিপদভঞ্জন বিশ্বাস।

(৬) স্বস্তিকা-৪ জুলাই ২০১৬, ৩ জুলাই ২০১৭, ২ জুলাই ২০১৮ সংখ্যা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

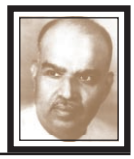

ড. শ্যামাপ্রসাদ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন

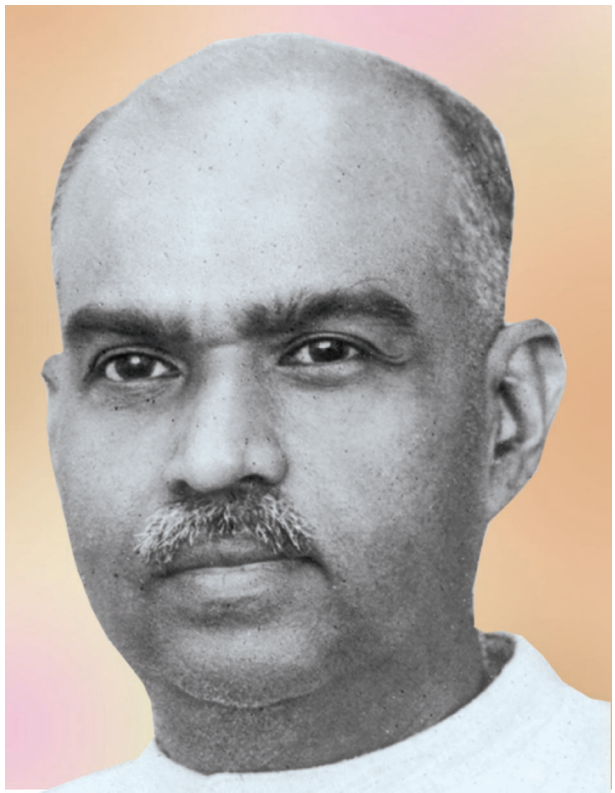

অম্লান কুসুম ঘোষ

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ। শিক্ষাজগৎ থেকে রাজনীতিক্ষেত্র, অর্থনীতি থেকে সমাজদর্শন— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই মহামানব তাঁর বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করতে বসে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকেই আলোকপাত করেন তার জীবনী ব্যাখ্যাকাররা। তবু তাঁর জীবনের কিছু কিছু দিক উপেক্ষিত থেকে যায় জীবনীকারদের আলোচনায়। সেরকমই একটি দিক হলো তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ করে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের এই দিকটি বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যায় তাঁর জীবনীকারদের আলোচনায়। আর ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, শ্যামাপ্রসাদের জীবনের এই আপাত উপেক্ষিত দিকটিকেই আক্রমণের লক্ষ্য করে ছিদ্রান্বেষীরা। তারা বলে শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীনতা সংগ্রাম তো করেনইনি বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য কী বলছে এ ব্যাপারে?

১৯৩৭ সালে গোটা দেশে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়। ভারতের প্রায় সবকটি রাজ্যেই কংগ্রেস জয়যুক্ত হলেও বাঙ্গলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বাঙ্গলা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ এবং এই প্রদেশের বেশিরভাগ আসন ছিল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের কোনো প্রার্থী জয়ী হতে পারেনি। বাঙ্গলায় মোট আসন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছিল কংগ্রেস, এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছিল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এবং এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছিল মুসলিম লিগ। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক না হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই দলের একজন এমএলএ-ও কিন্তু হিন্দু ছিলেন না। তিনটি দলই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ করে আসন পাওয়ায় দুটি দলকে জোট করে সরকার গঠন করতে হতো। মুসলমান বহুল দলের প্রধান হলেও ফজলুল হক কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করে সরকার করবেন না বরং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকার করতে আগ্রহী। তৎকালীন বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃত্বের কিছু অংশ এতে আগ্রহী থাকলেও বাদ সেধেছিলেন নেহরু। তাঁর বক্তব্য ছিল কংগ্রেস কোনো দলের সঙ্গে জোট সরকার গড়বে না। ফলস্বরূপ বাঙ্গলাতেও কংগ্রেস কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে সরকার গড়েনি। ফলে বাধ্য হয়ে ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট সরকার করেন এবং এই জোট সরকারের শাসনে মুসলিম লিগের তীব্র অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয় বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন বাঙ্গলার শিক্ষা জগৎ এবং অর্থনীতি জগৎ নিয়ন্ত্রণ করত কার্যত হিন্দু বাঙ্গালিরা। জোট সরকারের শাসনে মুসলিম লিগ এই দুটি জগৎকে কুক্ষিগত করতে সক্রিয় হলো। অর্থনীতি জগতের সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করলো শিক্ষা জগৎকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে বাধা দিতে লাগল মুসলিম লিগ সরকার। শিক্ষা জগতে তখন কীরকম ভাবে হস্তক্ষেপ করত মুসলিম লিগ সরকার তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের একটি অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৩৯ সালে একবার তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে তারাশঙ্করকে বলেছিলেন যে মুসলিম লিগ শাসনকালে বাঙ্গলায় বাংলাভাষার ওপর যে অত্যাচার চলছে এবং বাংলাভাষার মধ্যে যে হারে আরবি ফারসি শব্দ ঢোকানো হচ্ছে তাতে বাংলাভাষাটা বিলুপ্ত না হয়ে যায় আর আমার লেখাগুলো না হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর শিলালিপির মতো তাকে তুলে রাখতে হয়। এই অসহনীয় অত্যাচারের যুগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচানোর জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরোধে

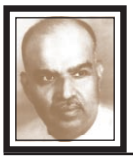

শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিতে আগমন এবং শরৎ বোসের পরামর্শে সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে হিন্দু মহাসভায় যোগদান। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবার পরেই শ্যামাপ্রসাদ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন কী করে জোট সরকার ফেলে দিয়ে এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের হিন্দু এমএলএ-দের মিলিয়ে একটা আলাদা সরকার গঠন করা যায়। সেই চেষ্টা অবশেষে ফলবতী হয়েছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে। কংগ্রেস এমএলএ-দের একটা অংশ বরাবরই চাইছিল হকের সঙ্গে আলাদা সরকার গঠন করতে। কেন্দ্রীয় বাধায় পারছিল না, কিন্তু ইতিমধ্যে সুভাষকে বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখে সাহস সঞ্চয় করে বাঙ্গলাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদের নির্দেশকে শিরোধার্য করে সেই এমএলএ-রা হকের সঙ্গে আলাদা সরকার গঠন করেছিল। সেই সরকারের শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শরৎ বোস, মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার আগেই ১৯৩৯ সালে ভারতের সব কটি প্রদেশে থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছিল, ফলে মুসলিম লিগ একচ্ছত্র ভাবে সবকটি প্রদেশে শাসন করেছিল। বাঙ্গলাও তখন ছিল তাদের শাসনাধীন। বাঙ্গলায় হঠাৎ তাদের সরকার পড়ে যাওয়া এবং জোট সরকার গঠন হওয়াকে তারা ভালো চোখে দেখেনি। যাইহোক, জোট সরকার চলতে থাকে এবং বাঙ্গলার হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ইতিমধ্যেই শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১৯৪২-এর আগস্টে। জোট সরকারের বয়স তখনও ৯ মাস পূর্ণ হয়নি। এই সময়টাকে দেখা যায় ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে। সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ যদি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিতেন তাহলে শ্যামাপ্রসাদ-হক মন্ত্রীসভার পতন তখনই হয়ে যেত, সুবিধা পেয়ে যেত মুসলিম লিগ। তারা আবার সরকার গঠন করত এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে সারা ভারতে যেমন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল সেরকম বাঙ্গলাতেও ক্ষমতা কুক্ষিগত করত। শ্যামাপ্রসাদ সেটা হতে দিতে চাননি, তাই সেই সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেননি বরং তিনি চেয়েছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে এবং মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে মানুষের যদি কিছু উপকার করা যায়। সেই সময় ছোটোলাটকে চিঠিতে তিনি সেকথা জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন নির্বাচিত ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা ও মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে যদি কাজ করতে পারে তাহলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এমনিতেই অর্থহীন হবে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ রচিত এই চিঠিটির দিকেই অনেকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেও এই চিঠিটিকেই তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার করে এবং বলে শ্যামাপ্রসাদ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এই চিঠিটির অন্তর্নিহিত কথাটির অর্থ কী? নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়া মানেই তো এক হিসেবে ভারতের স্বাধীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ তখন আর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজন থাকে না। এই চিঠিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করা না স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্য পথের সন্ধান করা? কিন্তু এরপরে মাস দুয়েক যেতে না যেতেই মেদিনীপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকারীদের উপর যখন পুলিশ অকথ্য অত্যাচার শুরু করলো এবং পুলিশের নিয়ন্ত্রণ জোট সরকারের হাতে অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীদের হাতে থাকল না বরং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল ছোটোলাট নিজে তখন শ্যামাপ্রসাদ অগ্নিবর্ষী চিঠি লিখলেন ছোটোলাটকে।

শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলার তৎকালীন গভর্নর জন হার্বার্টকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন তার উল্লেখ 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থে রয়েছে। চিঠিটার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম :

'জার্মানির অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ নৃশংস অত্যাচারের কথা আমরা শুনতে পাই, মেদিনীপুরেও তাই চলছে। সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে শত শত বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি লুঠ করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই এই কাজ করেছে। এমনকী ১৬ অক্টোবরের ঝড়ের পরেও গৃহলুণ্ঠন ও গৃহদাহের কাজ সমানভাবে চলেছে।...

নিরস্ত্র ও অসহায় জাতির সঙ্গে লড়াই করা খুবই সোজা। ভারতবাসী নিরস্ত্র, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ পক্ষ থেকে বলা হয় যে ভারতবাসী নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই যদি হয় তাহলে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক। তারপর সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ চলুক। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিশ্চয় ভারতবাসী এই পরিবর্তনকে সাদরে সমর্থন জানাবে।' (আমি সুভাষ বলছি : শৈলেশ দে : তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২২-৭২৩)।

এই অনলবর্ষী চিঠি লেখার পরই শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুর যেতে চান। বাধা দেয় ছোটোলাট। তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ। সেই পদত্যাগ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থনে ও ব্রিটিশ পুলিশের দমননীতির বিপক্ষে। যা সর্বতোভাবে প্রমাণ করে যে শ্যামাপ্রসাদ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ও সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষেই ছিলেন। মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে আর ফুল ও বিষ্ঠা পাশাপাশি থাকলে মাছি ফুল পরিত্যাগ করে বিষ্ঠা থেকেই নিজের জীবনরস সংগ্রহ করে। মানবজীবনেও সেরকম কিছু ব্যক্তি মৌমাছির মতো মহাজীবন থেকে মহৎ গুণ আহরণ করে আবার কিছু ব্যক্তি মাছির মতো মহাজীবনের ত্রুটি অন্বেষণ করে। এই মাছিতুল্য ব্যক্তিরাই শ্যামাপ্রসাদের মতো মহাজীবনের ত্রুটি অন্বেষণ করে এবং তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী বলে কুৎসা রটায়। কিন্তু চিরন্তন সত্য হলো এই যে শ্যামাপ্রসাদ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ▫

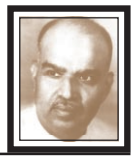

সর্বধর্ম-সমভাবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন? ন'য়ের দশকের ছাত্রাবস্থা থেকে আমরা এই প্রশ্ন শুনে আসছি। প্রকৃতপক্ষে, এক শ্রেণীর বামপন্থী চিন্তাবিদ ও তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্বজ্জনের একাংশ খুব সুচারুভাবে এই প্রশ্ন জনমানসে ভাবিয়েছেন, তার সঠিক উত্তর না দিয়েই বা এই বিষয় সম্পর্কিত বিতর্কে অংশগ্রহণ না করেই। একথা সত্য, ইতিহাস ড. মুখোপাধ্যায়কে তাঁর প্রাপ্য স্থান দেয়নি, কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতে ইতিহাস রচনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত বামপন্থী ইতিহাসবিদদের দ্বারা। একটি অদ্ভুত, অবাস্তব ও হাস্যকর ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ তৈরি করতে গিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে প্রকৃত সত্যকে ও তথ্যকে; উপেক্ষিত থেকেছে ভারতীয়ত্ব ও শ্যামাপ্রসাদের মতো প্রকৃত রাষ্ট্রবাদী ও দেশভক্ত নেতারা। আর সেই পরিসর দখল করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহিমান্বিত করা হয়েছে কিছু বিদেশি হানাদার, ঔপনিবেশিক ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীকে। তাই এই বিকৃত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন সরিয়ে শ্যামাপ্রসাদের জীবন দর্শন, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সর্বোপরি তাঁর সংবেদনশীল মননকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি।

ভারত কেশরী'র সর্বধর্ম-সমভাবী ও একাত্ম-মানবদরদি দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করতে গেলে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের যুবসমাজের একটা বড়ো অংশ জানেই না কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কতটা আন্তরিক ও স্বার্থহীন ছিল। সময়টা বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের প্রথম দিক। তীব্র অর্থকষ্ট ও শারীরিক সমস্যায় পড়লেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর স্ত্রীর শারীরিক অবস্থাও ততোধিক খারাপ। দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে বিষফোঁড়া হিসেবে এসেছিল ঋণের বোঝা। কবির অর্থসংকট এতটাই চরমে উঠেছিল যে, বাড়িভাড়া দেবার পয়সাও তাঁর ছিল না। তখন বিপন্ন বিদ্রোহী কবির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ড. মুখোপাধ্যায়।

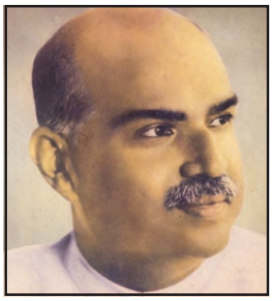

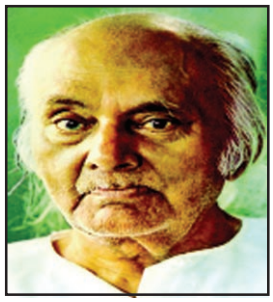

তিনি কবির সমস্ত ঋণ তো শোধ করেইছিলেন, উপরন্তু তাঁর সুচিকিৎসারও বন্দোবস্ত করেছিলেন। সস্ত্রীক কবিকে অধুনা ঝাড়খণ্ডের মধুপুরে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৪২ সালে ভারত কেশরীকে লেখা নজরুলের একাধিক চিঠি তার প্রমাণ। এই সংক্রান্ত একাধিক চিঠি জনসমক্ষে আছে, যেগুলির মাধ্যমে কবিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সাহায্যের জন্য।

আজ যাঁরা সংখ্যালঘু তোষণকেই 'সেকুলারিজম' বলে মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে গিয়ে যাঁদের কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে গো-মাংস ভক্ষণ করতে করতে হয়, তাঁদের পূর্বসূরিদের কেউ সেদিন এক বিপন্ন কবির সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তবুও তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলা হবে? আসলে তথ্য বিকৃত করে যখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তাঁকে সেকুলার সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন, তখন বুঝতে হবে, তাঁদের সেই আক্রমণ রাজনৈতিক এবং তাঁদের অবস্থানও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী। বাঙ্গলার সমাজ জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ড. মুখোপাধ্যায়ের 'সর্বধর্ম-সমভাবের' আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশি পল্লীকবি জসিমুদ্দিন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উপাচার্যের আসনে অধ্যাপক মুখার্জি। ওই সময় কবি জসিমুদ্দিনকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনাও প্রমাণ করে যে, ভারত কেশরী কোনো ধর্মীয় ও জাতিগত ছুঁতমার্গ নিয়ে কাজ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও তিনি জসিমুদ্দিনকে নানাভাবে সাহায্য করতেন এবং তাঁর পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ছিল প্রশ্নাতীত। আজ সন্ত্রাসদীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে যখন মানবাধিকার বিপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা যখন উল্লেখযোগ্যভাবে নীরব, তখন মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বকে দূরে সরিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারে শ্যামাপ্রসাদের সর্বধর্ম-সমভাবের মতাদর্শ। নজরুলের কালজয়ী সৃষ্টি, 'বিদ্রোহী' কবিতা। কবিসৃষ্ট বিদ্রোহী স্রোতের বিপরীতে হেঁটে, প্রথা ভেঙে, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জিগির তুলে সমাজকে অপশাসন মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের সাহচর্যে নবজীবন পাওয়া নজরুলের কল্পিত বিদ্রোহী শেখ আবদুল্লা কারাগারের অর্গল মুক্ত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নবজীবন দিতে পারেনি। আজ ভারত কেশরী নেই, কিন্তু আছে তাঁর জীবন-দর্শন, মতাদর্শ ও কর্মযোগ, যা তাঁর মৃত্যুর সাত দশক পরেও ভারতীয় সমাজ জীবনে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ◘

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

পক্ষপাতদুষ্ট আমলাগণ দেশের সার্বিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়

ড. তরুণ মজুমদার

তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যা কখনোই সর্বোচ্চ শিক্ষা হতে পারে না। উপযুক্ত চলার পথ এবং তা থেকে অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতাই মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলে। এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখেই মূলত সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্যদের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং পক্ষান্তরে এটা ধরে নেওয়া হয় যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করার ফলে অভিজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টরা খোলা মনে দক্ষতার সঙ্গে সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হতে পারবেন। কিন্তু সমাজের এই ধারণা এবং একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করল ষাট জন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্টের একটি খোলা চিঠি। যেখানে প্রেক্ষিত, সঠিক তথ্য এবং বাস্তবতাকে কার্যত অস্বীকার করে পরিবেশ মন্ত্রকের দু'জন প্রাক্তন সচিব-সহ ষাট জন প্রাক্তন আমলা মোদী সরকারকে কেন্দ্রীয় ভিস্তা প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েই শুধুমাত্র ক্ষান্ত হননি, বরং এই প্রকল্পের পরিকল্পনায় বড়োসড়ো ত্রুটির কথাও তারা বলেছেন, কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে তারা ত্রুটির বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। উলটে তারা লিখেছেন যে এই প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়ার পেছনে একটি নির্দিষ্ট সরকার ও তার নেতাদের স্মৃতিবিজড়িত বর্তমান পরিকাঠামো ছেড়ে যাওয়ার তাগিদ কাজ করেছে। এছাড়াও তারা বলেছেন যে একটি কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মোদী সরকার এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন, কারণ বিশ্বাস করা হয় বর্তমান সংসদ ভবনটি মোদী সরকারের কাছে নাকি অত্যন্ত অশুভ।

এই প্রকল্পের বাস্তব প্রেক্ষিতের দিকে এবার একটু চোখ ফেরানো যাক। সংসদ ভবনের কাঠামোগত নির্মাণশৈলী এবং সুযোগ-সুবিধা বর্তমান সময়ের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অপারগ। বেশিরভাগ বিল্ডিং স্ট্রাকচারাল লাইফ হয় শেষ করে ফেলেছে নতুবা শেষের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ৯২ বছর আগে যখন সংসদ ভবন নির্মিত হয়েছিল তখন দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সিসমিক জোন-২-এ অবস্থান করতো, বর্তমানে তা সিসমিক জোন-৪-এ অবস্থান করে। ফলত এই মেয়াদ উত্তীর্ণ নড়বড়ে স্ট্রাকচার ভূমিকম্পের সামনে যে অত্যন্ত অসহায় তা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে স্বাধীনতার সময় গড়ে পাঁচ লক্ষ জনসাধারণ পিছু একজন করে সাংসদ নির্বাচিত হতেন। বর্তমানে একজন সাংসদ গড়ে ২৫ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা একজন সাংসদের পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা এবং সংসদে উত্থাপন করা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ২০২৬ সালে পার্লামেন্টে সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর স্থিতাবস্থা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুড গভর্নেন্সের স্বার্থে সংসদীয় এলাকাগুলির ডি-লিমিটেশনের মাধ্যমে সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করা আশু কর্তব্য। সেক্ষেত্রে বর্তমান সংসদ ভবনের অপ্রতুল স্থান এই কাজে যে বাধা সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঠিক এই কারণেই মীরা কুমার লোকসভার স্পিকার পদে থাকাকালীন ১৩.৭.২০১২ তারিখে ভারত সরকারকে চিঠিতে নতুন পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণের অনুরোধ করেন। একই কারণে প্রাক্তন স্পিকার সুমিত্রা মহাজন এবং বর্তমান স্পিকার শ্রীওম বিড়লা যথাক্রমে ০.১২.২০১৫ এবং২.৮.২০১৯ তারিখে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লেখেন। ল্যুটিয়েন দিল্লির এই চত্বরে বর্তমানে যে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংগুলো রয়েছে তাতে ৫১টি দপ্তরের মধ্যে মাত্র ২২টি দপ্তরকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি ২৯টি দপ্তর সমগ্র দিল্লিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর ফলে ভারত সরকারকে প্রতিবছর এক হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ রাজকোষ থেকে ভাড়া বাবদ এবং কর্মীদের আন্তঃবিভাগীয় যাতায়াতের জন্য বাধ্যতামূলক খরচ করতে হয়। এতে রাজধানী শহরে আবশ্যিকভাবেই নিত্যনৈমিত্তিক যানজন ও দূষণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রেক্ষিত, বাস্তবতা ও সঠিক তথ্যকে না জেনে বা সুচারুভাবে অস্বীকার করে শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনকে হাতিয়ার বানিয়ে কিছু অভিজ্ঞ প্রাক্তন আমলা দেশকে বিপথে চালনা করতে যে নোংরা খেলায় মেতে উঠেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ধিক্কারজনক। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জহর সরকার-সহ ওই ষাট জন প্রাক্তন আমলা সম্বন্ধে বলেছেন, 'এরা শুধুমাত্র পড়াশোনা জানা মূর্খই নয়, এরা দেশের পক্ষে অপমান'। তিনি তাদের মস্তিষ্কের চিকিৎসা করানোর পরামর্শও দিয়েছেন। সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সমাজের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শকে দূরে রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে সমর্থন করবেন। বস্তুত কতিপয় প্রাক্তন আমলার এইরূপ বোধহীন কাজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে অর্ধ শিক্ষা এবং সমস্ত বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে চলা বুরোক্রাটিক সিস্টেম দিয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হওয়া চলে না। ল্যাটেরাল এন্টির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যায় লিবারেল প্রফেশনের জ্ঞানী মানুষেরা এবং টেকনোক্রাটরা যতদিন না প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন ততদিন সমাজের চিন্তা চেতনার বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা শম্বুক গতিতেই যে চলবে— তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ◻

বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

এক শিল্পপতি ধনপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার অসুখ করলো। ডাক পড়লো তৎকালীন কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তারের। তিনি এলেন, রোগী দেখলেন, খস্‌খস্‌ করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন। তারপর রোগীকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'ঘনশ্যাম, ডাক্তার ডাকলে তাঁকে ফিজ দেবে। কারণ, ডাক্তারকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। তোমাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। ওষুধগুলো কিনবে। কারণ, ওষুধ কোম্পানিগুলোকে বাঁচতে হবে। কিন্তু ওষুধগুলো তুমি খাবে না। কারণ, তোমাকেও বাঁচতে হবে তো।

একদিন এক রোগী এসেছে ডাক্তারের চেম্বারে। পুরনোরোগী, অর্থাৎ আগেও এসেছিল। অনেকদিন দেখা নেই। ভালো হয়ে গেছে, সেই খবরটাই দিতে এসেছে। ই.সি.জি.-তে কোনো দোষ নেই, এমনিতেও কোনো সমস্যা নেই, বেশ সুস্থ বোধ করছে। খুশিভরা মুখ। ডাক্তার সেদিকে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জুনিয়রকে ডেকে একটা কী ইনজেক্‌শন দিতে বললেন।

রোগী তো অবাক। আসামাত্র কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ইনজেক্‌শন কেন? সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী। বললেন, উনি তো এখন বেশ ভালো আছেন। কদিন থেকে গলদা চিংড়ির কালিয়া খেতে চাইছেন। দিতে পারি?

—গলদা চিংড়ি? তা দেবেন।

জুনিয়র ওদের পাশের ঘরে রেখে ফিরে আসতেই বললেন, ওরা কীসে এসেছে দ্যাখ তো। গাড়ি-টাড়ি আছে কি না?

—না তো, ট্রাম থেকে নামতে দেখলাম।

—এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলো। আর তুমি ওদের সঙ্গে যাও। যদি বাড়ি পর্যন্ত টিকে যায়, ইনজেকশনটা আরেকবার দিও। তবে মনে হচ্ছে—

বাকিটুকু আর বললেন না। যা বলতে চেয়েছিলেন তাই ঘটল। বাড়ি পৌঁছতে হয়নি। তার আগেই গাড়িতেই সব শেষ।

বিখ্যাত ডাক্তার যখন মুখ্যমন্ত্রী, সেসময় চোখের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যেতে হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিশাল হাসপাতাল। সারা দুনিয়ার যত কঠিন কঠিন চোখের রোগীর ভিড় সেখানে। ডাক্তার হাসপাতালে ঢুকেই নাকটা একটু টানলেন মনে হলো। এদিক ওদিক তাকালেন একবার। তারপর পাশে যিনি ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি স্মলপক্সের পেসেন্ট রাখা হয়?

—স্মলপক্স? আকাশ থেকে পড়লেন সার্জন। এত বড়ো একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এরকম একটা আনাড়ি সুলভ প্রশ্ন শুনে বোধহয় কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ করলেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, এটা চোখের রোগের হাসপাতাল।

কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল, কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে কোনো একটা বেডে এক রোগীর দেহে বসন্তের গুটি দেখা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে থাকার সময় কোনো একটা জটিল ও জরুরি বিষয়ে আলোচনার জন্য জনৈক বিভাগীয় সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। পুরনো আমলের পাকা আইসিএস। তেমনি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভীক। মন্ত্রীদের মন রেখে কথা বলেন না। মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন।

একটা কী বিষয়ে মতভেদ হচ্ছে দুজনের। কেউ কারও যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। তুমুল তর্ক। তার মাঝখানে ডাক্তার (মুখ্যমন্ত্রী) হঠাৎ বলে উঠলেন, জিভ দেখি।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলেন না সেক্রেটারি।

মুখ্যমন্ত্রী এবার বেশ পরিষ্কার করে বললেন, জিভটা দেখাও।

—জিভ দেখাব?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা সে পরে হবে। এই ব্যাপারটার আগে ফয়সালা হয়ে যাক।

—তার আগে জিভটা একবার দেখি না?

সেক্রেটারি তর্ক থামিয়ে জিভ বের করলেন। এক নজর তাকিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একটা কাগজ টেনে নিয়ে কী লিখলেন এবং সেটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, দিনে দুবার করে খেয়ো। তিনদিন অফিসে এসো না, কমপ্লিট রেস্ট।

কলকাতার এক তরুণ ডাক্তার— সবে তার নামডাক শুরু হয়েছে। কলকাতার তৎকালীন এক বিখ্যাত ডাক্তারের কন্যার সঙ্গে তরুণ ডাক্তারের মনের আদান-প্রদান হয়েছে। কিন্তু কন্যাটি বাড়িতে তাঁর ভালোবাসার কথা জানাতে ভয় পায়। তরুণটি খুব সাহসী। তাই নিজেই তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে তরুণীর পিতাকে বলেন। তরুণীর পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন— 'তাঁর মাসিক রোজগার কত?'

তরুণটি উত্তর দেন— 'দশ হাজার টাকার কিছু বেশি।'

তরুণীর পিতা বলেন— 'ও টাকায় আমার কন্যার মাসিক প্রসাধনী খাতে খরচ হয়। খাওয়া-পরা কী দিয়ে হবে? কাজেই এ বিয়ে সম্ভব নয়।'

তরুণ ডাক্তার মাথা নীচু করে চলে এলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন— 'জীবনে আর কোনোদিন বিয়ে করবেন না?'

পরবর্তীকালে চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গঙ্গার পূর্বপাড়ে নদীয়া জেলার ৪৫টি গ্রাম নিয়ে সামরিক উপনিবেশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট নিজের নামেই রুজভেল্টনগর-এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। প্রেমকে পরিণয়ে রূপ দিতে না পেরে সেই তরুণ ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'রুজভেল্ট নগরকে' উপনগরী হিসেবে নবকলবরে সাজিয়ে তুলে তার নাম দিয়েছেন তাঁরই প্রেমিকার নামে 'কল্যাণী'। তরুণ সেই ডাক্তারের নাম বিধানচন্দ্র রায়। আর তরুণীর পিতা বিখ্যাত সেই ডাক্তারের নাম নীলরতন সরকার।

বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গলার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর। যিনি সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙ্গলার গৌরবময় ইতিহাসে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই বংশের একজন অংশীদার হলেও বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্রকে নিজের ভিটে ছেড়ে বরহমপুরে চলে আসতে হয়। বিধানচন্দ্রের মাতার নাম অঘোরকামিনী দেবী। বিধানচন্দ্র তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮২ সালের ১ জুলাই তৎকালীন ব্রিটিশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির পাটনার বাঁকিপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিধানচন্দ্রের জীবনে তাঁর পিতা-মাতার চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

ঠাকুরমা আদর করে নাম রেখেছিলেন ভজন। সেই ভজন পরবর্তীতে একজন ডাক্তার হিসেবে কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তার আগের মাসেও ডাক্তারি থেকে তাঁর আয় ছিল ৪২ হাজার টাকা। অথচ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই নিজের মাইনে ঠিক করলেন মাত্র ১,৪০০ টাকা।

তাঁর কর্মজীবন ছিল খুবই বর্ণময়। স্বাধীন ভারতের একজন প্রথম সারির নেতা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, তাঁর প্রভাব প্রসারিত ছিল দিল্লি পর্যন্ত। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেও রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে সারাটা জীবন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির কথা ভেবেছেন। খাদ্যসমস্যা, পরিবহণ, শিল্পায়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলার জগৎ সবকিছু নিয়েই তিনি ভেবেছিলেন। দুর্গাপুর, শিল্পনগরী, কল্যাণী উপনগরী, সল্টলেক, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, ওইরয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি, ভূতল রেলওয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা প্রভৃতি নানা দিকে তাঁর নজর ছিল।

চিকিৎসা জগতে তিনি গরিব মানুষের ভগবান ছিলেন। অনেক উদারতার উদাহরণ আছে তাঁর! ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ৩০ জুন তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরেরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই তাঁর জন্মদিন। বহু মানুষ আগেরদিন থেকেই কলকাতায় আসতে শুরু করেন তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। অসুস্থ অবস্থায় সেই সমস্ত মানুষদের উদ্দেশে একটি বার্তা লিখে নিজে তাতে সই করে তাঁর বাড়ির দরজায় সেঁটে দিতে বলেন। তাঁর সেই বার্তা ছিল— "According to the advice of the doctors it is not Possible for me to receive Personally your congratulations and good wishes an my birth day. I reciprocate the same, and requests my friends to accept my heartful thanks and I pray for their well being..."

Bidhan Chandra Ray.

১৯৬২ সালের ১ জুলাই জন্মদিনেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বঙ্গমাতা হারালেন তাঁর এক সুসন্তানকে। তাঁর প্রতি রইল শতকোটি বিনম্র প্রণাম।

With Best Wishes
from :

JHUNJHUNWALA

JANKALYAN

TRUST

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

অসমের কর্মযোগী মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন

রঞ্জন কুমার দে

কোনো এক মহাত্মা বলেছিলেন, 'স্বপ্ন এটা নয় যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয়'। সম্ভবত সেই স্বপ্নকেই সামনে রেখে যুবক হিমন্ত কলেজ জীবনে প্রেমিকা রিঙ্কির কাছে নিজের অভিলাষ প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই হিমন্ত নিজের রাজনৈতিক উচ্চাশা স্থির করে নিয়েছিলেন। ২০০১ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারে বিধায়ক হিমন্ত দলের প্রথম সদস্য হয়েই প্রবীণ নেতাদের পাশ কাটিয়ে মন্ত্রীসভায় নিজের জায়গা পোক্ত করে নেন। নিজের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও প্রতিভার গুণে ক্রমশ তরুণ গগৈ ব্রিগেডের সেকেন্ড হাই কমান্ড হয়ে উঠেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কিন্তু তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন তৃতীয়কালীন সরকারে উচ্চস্তরীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক উচ্চকাঙ্ক্ষায় অবশেষে ২০১৫ সালে হিমন্ত গেরুয়াবস্ত্রে পদ্মাসনে বসেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে নর্থ-ইস্টের রাজ্যগুলির মধ্যে তিনি নেডার গুরুত্বপূর্ণ আহ্বায়ক পদ অতি দায়িত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন। এক সময় কংগ্রেসের গড় উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে এখন নেডা পরিচালিত সরকারে বিজেপির যে কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে তিনি ত্রাতার ভূমিকায় সংকটমোচনে নিজেকে প্রমাণ করেছেন এবং হয়ে উঠেছেন দলের অপ্রতিরোধ্য নেতা ও রাজনৈতিক চাণক্য।

২০২১ সালের ১০ মে হিমন্ত বিশ্বশর্মার অসমে মুখ্যমন্ত্রিত্বের অভিষেক ঘটে। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নিজ গুণে অনুজ হিমন্তের নাম প্রস্তাব করে অসম তথা সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আত্মদানের এক বিরল ইতিহাস প্রতিস্থাপন করে গেলেন। ভারতবর্ষে অসংখ্য নবাগত মুখ্যমন্ত্রীর নজির থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের বিগত তরুণ গগৈ এবং সর্বা সরকারের মন্ত্রীসভায় অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় থাকায় স্বাভাবিকভাবে প্রায় পুরো মন্ত্রণালয়ই তাঁর নখদর্পণে। স্বভাবতই সেই কারণে মাত্র ৩০ দিনের সরকারে অসমের সাধারণ জনগণ এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত করতে পারছেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ছিল নবাগত মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম চ্যালেঞ্জ। ভারত যে সময় অক্সিজেনের সিলিন্ডারের অভাবে ধুঁকছিল, বিভিন্ন দেশ অকৃত্রিম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সেই অসম পার্শ্ববর্তী রাজ্যে মেঘালয়, অরুণাচল, ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে যথেষ্ট অক্সিজেনের জোগান ধরিয়েছিল। এই মহামারিতেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এতো সবল যে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রয়োজনানুসারে অসম সরকার ২০০০ ডোজ রেমডিসিবির ইনজেকশন সেখানে সরবরাহ করেছে। এ ছাড়াও তেলেঙ্গানা রাজ্যের অনুরোধে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের প্রতিষেধক অসম সরকার হায়দরাবাদে পাঠাতে পেরেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ টিকাকরণ অসম সরকার সুনিশ্চিত করেছে এবং জুলাই মাস থেকে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ টিকাকরণের লক্ষ্য প্রক্রিয়া ঘোষণা করেছে। হিমন্ত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনা মোকাবিলায় এতোটাই সফল যে রাজ্যজুড়ে একটাও অক্সিজেনজনিত সমস্যা, বেডের কমতি কিংবা চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতার একটি উদাহরণ হলো যখন হোজাইয়ে এক করোনা যোদ্ধা ডাক্তারকে কিছু লোক পাশবিক অত্যাচার করলে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের হাজতে পাঠানো হয়। এমনকী সংশ্লিষ্ট সেই ডাক্তারের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করে তাঁর উন্নত চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকারের পূর্ব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার অতি শীঘ্রই ১ লক্ষ বেকারকে নিযুক্তি প্রদানে মন্ত্রী অজন্তা নেওগের নেতৃত্বে একটি কমিটি

ফ ঃ ৫

গঠন করে প্রত্যেক বিভাগকে তাদের শূন্যপদের চাহিদার রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের উপহাসের প্রতি কটাক্ষ করে জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কোনো ভাওতাবাজি নয়। তাই এই এক লক্ষ চাকরির নিযুক্তি অনুষ্ঠানে বিরোধীরাও উপস্থিত থাকবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে প্রয়োজনে নিযুক্তির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কিন্তু কমবে না। ড্রাগ মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে হিমন্ত সরকার যেন খড়্গহস্ত। সরকারের মাত্র ৩০ দিনের ইনিংসে ২৬৪টি মামলা রেজিস্টার্ড, মোট গ্রেপ্তার ৪৪১ জন, হেরোইন আটক ৬.৫৭৯৯ কেজি, গাঁজা আটক ৫৭৮৫.৮৪৬ কেজি, কফসিরাফ ১১ হাজার ৬৮১ বোতল, টেবলেট ৯২ হাজার ৩৬৬টি মরফিন ২০ গ্রাম, অপিয়াম ৪২৬ গ্রাম আটক-সহ মোট নগদ ১৭ লক্ষ ১১ হাজার ১৬০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হিমন্তের অপহৃত রিতুল শইকিয়ার মুক্তির আবেদনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আলফা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে মুক্তি করে দেয়। আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া এক প্রেস বর্তায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তকে 'দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে আলফার তিন মাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এর থেকে অনেকটা পরিষ্কার যে অতি শীঘ্রই সরকার এবং আলফার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কয়েক যুগের হিংসা পেরিয়ে শান্তির একটি সুরাহা হবে অসমে। মাইক্রো ফিন্যান্স বা ক্ষুদ্র ঋণ মকুব হিমন্ত ব্রিগেডের অন্যতম প্রতিশ্রুতিতে ছিল। সেই অনুযায়ী সরকার মন্ত্রীসভায় বিশেষ কমিটি গঠন করে গ্রাম্য মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে যথেষ্ট উদ্যোগীও হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কার্যালয় জনস্বার্থে কয়েকটি শিফটে বিভক্ত করে ২৪ ঘণ্টা সেবার ব্যবস্থা করেছেন। অসমের প্রত্যেকটি জেলার সরকারি কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সবকয়টি জেলার ভার নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন এবং কাজের গতি আনতে সাপ্তাহিক বৈঠকে মন্ত্রীদের সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট পেশ করতে হবে। মাত্র ৩০ দিনের এই সরকার কুশল কোঁওর সর্বজনীন বৃদ্ধ পেনশন, ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন এবং দিনদয়াল দিব্যাঙ্গ যোজনার অর্থের সাহায্যে হিতকারীদের প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর সুবন্দোবস্ত সরকার করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর শিশু সেবা প্রকল্পে কোভিড সংক্রমণে মা-বাবা হারানো বা উপার্জনশীল পিতা হারানো শিশুদের সরকার প্রত্যেক মাসে ৩৫০০ টাকার ভাতা চালুকরণে তাদের আবাসিক স্কুলে বিনামূল্যে অন্ন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এমনকী এইসব কন্যা সন্তানের জন্য সরকার বিয়েতে এক তুলা সোনা এবং নগদ ৫০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে রাখবে।

এছাড়াও নবাগত মুখ্যমন্ত্রী বন্যা সমস্যা ও বাঁধ প্রকল্প, গোরু চোরাকারবার রোধ, কয়লা, সুপারি সিন্ডিকেটে ব্যবস্থা গ্রহণ, নুমড়ি তেল শোধনাগারে বিনিয়োগীকরণ, অসম সীমান্তে দশটি ব্যাটেলিয়ান নিয়োগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একজন কর্মবীরের পক্ষেই সম্ভব। চা শ্রমিকদের মাত্র ৩৮ টাকা মজুরি বৃদ্ধিতে তাদের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যথাক্রমে দৈনন্দিন হাজিরা ১৮৩ টাকা এবং ২০৫ টাকায় পৌঁছিয়েছে। কিন্তু এই মজুরি খুব যৎসামান্য এবং তাঁদের পাওনাটা আরেকটু হওয়া অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ছিল। অসম তথা বরাক উপত্যকায় কাগজকল পুনঃস্থাপনে সরকারের অনীহা থাকলেও অন্ততপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটা আর্থিক প্যাকেজের ব্যবস্থা সরকার করে দিলে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে এরা বাকিটা জীবন কিছুটা হলেও নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত। কর্মবীর এই মুখ্যমন্ত্রী জনস্বার্থে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেও বিরোধীদের অনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে তিনি অনেকটা মর্মাহত। সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অসমের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি জমি, দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে নামলে দেখা যায় এইসব ভূদস্যুদের হয়ে প্রতিবাদ করছেন মিত্র জোটের একঝাঁক নেতা। তাই হয়তো মুখ্যমন্ত্রী খানিকটা অভিমানে লিখেছেন যখন এআইইউডিএফ দল বলবে কেউ সত্রের জমি দখল করতে পারবে না তখনই নতুন সমাজের সৃষ্টি হবে। হিমন্ত সরকার শুধু হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে গো-হত্যা বন্ধ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুমের বিবৃতি টেনে বলেছে যে, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে গোহত্যা উচিত নয়। যাই হোক, নবাগত সরকারের ৩০ দিনের রিপোর্টে যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। তবে সরকারকে দলের ভেতরের দালাল ও চাটুকারদের থেকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অসমের জনসংখ্যা বিস্ফোরণে যথেষ্ট চিন্তিত, তাই এই কর্মযোগী মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অবশ্যই আশা রাখা যায় যে অতি শীঘ্রই সরকার বিধানসভায় কড়া আইন পাশ করিয়ে অসমকে ভবিষ্যতের জন বিস্ফোটকের দুর্যোগ থেকে মুক্তি দিবেন।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মণীন্দ্র কুমার দে গত ১ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি স্বয়ংসেবকদের কাছে বাসুদা নামে পরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রয়াত অহীন্দ্র কুমার দে'র অনুজ।

* * *

মালদানগরের স্বয়ংসেবক দেবপ্রসাদ চৌধুরী গত ২৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তারাপদ স্বর্ণকার গত ২৬ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যা ও তিন নাতি রেখে গেছেন।

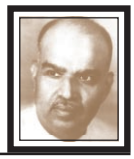

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা ?

বিনয়ভূষণ দাশ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। আর স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। ভারতের সুসন্তান এইসব মনীষীদের কারো মৃত্যুরহস্যই এখনো উন্মোচিত হয়নি। নেতাজী সুভাষের ক্ষেত্রে কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তাঁর মৃত্যুরহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কোনো তদন্তই হয়নি। এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর রাজত্বকালে মৃত্যু হয়েছে দুই মুখোপাধ্যায়— ড. শ্যামাপ্রসাদ এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুরহস্যের নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কারা তাঁর এই অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।

ড. শ্যামাপ্রসাদ তখন ভারতীয় সংসদে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী ও নেতা। কার্যত তিনি ছিলেন বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত জোট, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা। জনসঙ্ঘ, রামরাজ্য পরিষদ, হিন্দু মহাসভা, গণতন্ত্র পরিষদ, আকালি দল, ঝাড়খণ্ড পার্টি ও কয়েকজন নির্দল সাংসদকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই জোট। সংসদে তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাংসদ সংসদে হাজির থাকতেন,আর প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা জওহরলাল নেহরু কেন জানি না বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ড. শ্যামাপ্রসাদের জবাবি ভাষণে কী বলবেন ভেবে উদ্বিগ্ন হতেন। জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে জওহরলাল মাঝে মাঝেই মেজাজ হারাতেন। নেহরু স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যা ভাবতেন বা ঠিক করতেন সেটাকেই গুরুত্ব দিতেন। সংসদে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার মতো সাংসদ কংগ্রেসে ছিল না, একমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদই তাঁর বক্তব্যের ত্রুটিগুলো ধরতেন এবং যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেগুলি খণ্ডন করে সঠিক দিশা নির্দেশ করতেন। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক সহযোগী, জনসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি এক স্মৃতিচারণে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যের উল্লেখ করেন যেখানে তিনি বলেছিলেন, ''আমি সমগ্র ভারতের ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সেখানে একজনকেও এমন পাইনি, যিনি নেহরুজীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।'' শ্যামাপ্রসাদ সংসদে তাঁর প্রথম ভাষণেই পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্‌বাস্তু এবং জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। নেহরু তাই সর্বদাই শ্যামাপ্রসাদের থেকে অব্যাহতি চাইতেন।

৩৭০ ধারা বলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ কতকগুলি অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন নেহরু। ফলে জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকী শেখ আবদুল্লার মতো এক স্থানীয় নেতা বলে বসেন, 'Indian parliament had no jurisdiction over the Kashmir State.'

সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়। রাজ্যকে স্বতন্ত্র বা নিজস্ব সংবিধান, স্বতন্ত্র নাগরিকতা আইন, নিজস্ব পতাকা, আলাদা সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি নানা অধিকার দেওয়া হয়। তাছাড়াও ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'মুখ্যমন্ত্রী' না বলে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো। সেই সময় একই দেশ ভারতে দুজন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও শেখ আবদুল্লাহ, দুজন রাষ্ট্রপ্রধান ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত, দুই সংবিধান এবং দুই জাতীয় পতাকা বা নিশান— অর্থাৎ একই দেশের মধ্যে দুই আইন, দুই নিশান বা পতাকা, দুই প্রধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওই ৩৭০ ধারা আইনে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একই দেশে এই ধরনের দুই আইন মেনে নিতে পারেননি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৫৩-তে তাঁর সংসদীয় জীবনের শেষ বক্তৃতায় তিনি এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য এবং জম্মুবাসীদের সমস্যার সম্মানজনক সমাধান চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান।

সেই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে কোনো ভারতীয় প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর ইনার লাইন পারমিট লাগত। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনে বলা হয়েছে, ILP Inner Line Permit is a travel document issued by the Government of India allowing an Indian and foreigner traveller to travel to protected areas for a limited period. While obtaining this permit is mandatory for all other citizens of India and foreigners, the citizens of Jammu and Kashmir State are exempted. সুতরাং তিনি ভারতীয়দের পক্ষে বৈষম্যমূলক এবং অপমানজনক এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির দাবিতে এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে পারমিট ছাড়াই ওই রাজ্যে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে তাঁর অনেক হিতৈষী তাঁকে এই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যেতে নিষেধ করলেন। তাঁরা অনুমান

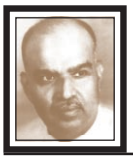

করেছিলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহ কোনো দুরভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সাংসদ ও বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নোয়াখালি যাত্রার সঙ্গিনী ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনী ও আরও অনেকেই তাঁকে এই যাত্রায় নিষেধ করেছিলেন। তৎকালীন সাংসদ ও বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা তাঁকে কাশ্মীর যেতে নিষেধ করে বলেছিলেন, 'আপনি নিজেকে আপনার শত্রুপক্ষের খপ্পরে নিয়ে গিয়ে ফেলছেন।' উত্তরে তিনি বলেন, তিনি বন্দি হতে যাচ্ছেন না; তাঁকে ভারত সরকার কাশ্মীরে ঢুকতেই দেবে না, ভারতেই বন্দি করে রাখবে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তৎকালীন প্রধান স্বামী সৎচিদানন্দের সঙ্গে দেখা করলে তিনি শ্যামাপ্রসাদকে বলেন, 'যাও, কিন্তু কোনো কিছু খাবার আগে অতি বিশ্বস্ত কাউকে খাইয়ে আগে দেখে নিও।' তাঁরা সবাই হয়তো অন্য কিছু অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি সবকিছু বাধা ও সবার আশঙ্কাকে অতিক্রম করে যখন জম্মু ও কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গী হলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, গুরুদত্ত বৈদ্য, টেকচাঁদ শর্মা এবং বলরাজ মাধোক। সঙ্গে গেলেন কয়েকজন সাংবাদিকও। ৮ মে, ১৯৫৩-র গ্রীষ্মের এক রৌদ্রদগ্ধ দিনে দিল্লি রেল স্টেশন থেকে স্টিম ইঞ্জিনে টানা একটি ট্রেন সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ছাড়ল। ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার যাত্রী হলেন তাঁরা। সেই সময়ে জম্মুতে জম্মু প্রজা পরিষদের পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি এবং কাশ্মীরের স্বতন্ত্র সংবিধান, স্বতন্ত্র নিশান বা পতাকা এবং স্বতন্ত্র প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদ বাতিলের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন চলছিল। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের একজন সোচ্চার সমর্থক। এই ধরনের এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি পঞ্জাবের আম্বালা, অমৃতসর, পাঠানকোট হয়ে যখন রাভি নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকছেন পুলিশ তাঁর গাড়ি আটকে দিল এবং তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মি. আজিজের গ্রেপ্তারি নির্দেশ অনুযায়ী কাঠুয়ার পুলিশ সুপার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তারিখটা হলো ১১ মে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অটলবিহারী বাজপায়ীকে বলেন, 'দেশের জনগণকে জানিয়ে দিও, আমি শেষ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকেছি; কিন্তু বন্দি হয়ে। আমার অবর্তমানে দেশের কাজ যেন থেমে না থাকে।'

ড. শ্যামাপ্রসাদকে অনুসরণ করায় গুরুদত্ত বৈদ্য ও টেকচাঁদ শর্মাকেও বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হলো। অথচ এমনটা হবার কথা নয়। আগেই লিখেছি, ইনার লাইন পারমিট দেবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, সুতরাং এ আইন কেউ লঙ্ঘন করলে কেন্দ্রীয় সরকারেরই ব্যবস্থা নেবার কথা। যদি কাউকে এই আইন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেপ্তার করতে হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারেরই করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হলো না। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যারা দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা শ্যামাপ্রসাদ-সহ অন্যদের সহায়তাই করেন। ট্রেনে তাঁর যাত্রাপথে প্রথম থেমেছিলেন পঞ্জাবের আম্বালায়। তারপর সেখানে জনসভায় ভাষণ দেবার পরে গাড়িতে নীলখেরী ও কারনাল হয়ে ফাগওয়ারা। ফাগওয়ারা থেকে ট্রেনে জলন্ধর হয়ে অমৃতসর। ট্রেনে গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার তাঁকে জানালেন যে, পঞ্জাব সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের পাঠনকোটে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, অমৃতসর বা পাঠানকোট কোথাও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো না। অমৃতসরের এক বিশাল জনসভায় নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ওয়ে পুত্তর! জিৎ কে আভিন, আইওয়ান না আভিন।' মানে 'ও আমার পুত্র, তুমি না জিতে ফিরে এসো না।' পাঠানকোটে পৌঁছালে আবার সেই ডেপুটি কমিশনার এসে অন্যরকম কথা শুনিয়ে গেলেন তাঁদের। তাঁর এবারের কথা অনুযায়ী, ড. শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে ইনার লাইন পারমিট ছাড়াই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। মনে হলো, কারো অদৃশ্য ইশারায় যেন বদলে গেল আগের নির্দেশনামা। অর্থাৎ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে, জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণের আওতায় তাঁকে নিয়ে আসা হবে। অতএব সেই অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের মাধোপুরা চেকপোস্টে সেই ডেপুটি কমিশনার তাঁকে বিদায় শুভেচ্ছা জানালেন। এরপর তাঁর জিপ রাভী নদীর ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছালেই জম্মুর কাঠুয়ার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট তাঁকে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নির্দেশনামা দেখালেন যেখানে বলা হয়েছে, "Dr. Symaprasad Mookherjee shall not enter, reside or remain in any part of the State of Jammu and Kashmir." তিনি ঘোষণা করলেন, যেহেতু ভারত সরকার তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরে বিনা পারমিটে (এই পারমিট ভারত সরকারেরই ইস্যু করার কথা) প্রবেশ করতে দিয়েছেন, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে যাবেনই। এরপর ওই একই সুপারিন্টেনডেন্ট পকেট থেকে আরও একটি সরকারি নির্দেশনামা, জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, মি. আজিজের গ্রেপ্তারের নির্দেশনামা দেখিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন যা আগেই বলেছি। পুলিশের জিপে তাঁদের লখনপুর, বাটরোট হয়ে শ্রীনগর নিয়ে গিয়ে দুপুর ৩টে নাগাদ তাঁকে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করা হলো। জেল সুপার ড. শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে শরর থেকে আট মাইল দূরের ডাল লেকের কাছে একটা ছোটো বাড়িতে রাখলেন, সেই বাড়িটিই রূপান্তরিত হলো কারাগার হিসেবে। ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবনের শেষ ৪৫ দিন এই ছোট্ট বাড়িটিই সাক্ষী হয়ে রইল। তাঁর অসুস্থতা বাড়লে ডাঃ আলি আহম্মদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে ২২

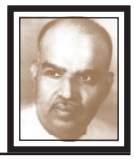

জুন ওই অস্থায়ী জেল থেকে শ্রীনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সহ-জেলবন্দি গুরুদত্ত বৈদ্য এবং টেকচাঁদকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেলসুপার তাতে রাজি হননি। ফলে নির্বান্ধব তাঁকে একাই হাসপাতালে যেতে হয়। তাঁকে ভরতি করা হয় স্টেট জেনারেল হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগে। এখানেই পরদিন রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটে এই মহান দেশপ্রেমিকের দেহাবসান হয় কিন্তু তাঁর দেহাবসানের খবর কলকাতায় তাঁর পরিবারকে দেওয়া হয় পরেরদিন সকাল পৌনে ছটা নাগাদ, তাঁর মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পরে।

এই প্রবন্ধে অন্য প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সুযোগ নেই। কারা তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য দায়ী সে প্রসঙ্গ আলোচনা করেই এই প্রবন্ধের উপসংহার টানবো।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সারা দেশের আপামর মানুষ পছন্দ করলেও প্রধানমন্ত্রীদ্বয়— জওহরলাল নেহরু এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ দুজনের কেউই তাঁকে পছন্দ করতেন না, তাঁরা তাঁর লাগাতার বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের এই বিরোধিতা শ্যামাপ্রসাদের শ্লাঘনীয় বাগ্মিতা, যুক্তিজাল বিস্তারে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা; দেশের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসাকে তাঁরা ঈর্ষা করতেন।

এবারে দেখা যাক তাঁর কাশ্মীর প্রবেশ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাক্রম।

তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করার আগে ভারত সকারের বিভিন্ন আধিকারিক তাকে গ্রেপ্তার না করে তাঁর কাশ্মীর প্রবেশের পথ সহজ করে দিয়েছে; অথচ, ইনার লাইন পারমিট না নিয়ে প্রবেশ করলে তাঁকে ভারত সরকারেরই গ্রেপ্তার করবার কথা। কিন্তু সেটা তা না করে তাঁকে সাহায্যই করা হয়েছে। এটা কেন করা হলো আর কার ইশারায়ই বা করা হলো? দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলে তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে, ভারতেরই কোথাও বন্দি করে রাখতে হতো। বোঝা যাচ্ছে, চক্রান্তকারীরা সেটা চায়নি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, শ্যামাপ্রসাদকে যে কোনোভাবে কাশ্মীরে নিয়ে ফেলা। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার ১৩.০৫.১৯৫৩-য় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'It was learnt from sources close to the Kashmir Govt. that the action which they had taken in arresting Dr. Mookerjee of the State border had been done with the full knowledge and support of the Govt. of India.' অস্যার্থ, কাশ্মীর সরকার এই জঘন্য কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞাতসারে এবং সমর্থনেই করেছিল।

তারপর, রাভী নদীর ব্রিজের উপর গ্রেপ্তারের সময় তাঁকে কাঠুয়ার পুলিশ সুপার একই সময়ে পরপর পকেট থেকে দুটি নিষেধাজ্ঞাপত্র— একটি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং জম্মু ও কাশ্মীরের আইজিপি মিঃ আজিজের গ্রেপ্তারি পরোওয়ানা কি করে বার করে তাঁকে দেখালেন?

শ্যামাপ্রসাদের শেষযাত্রায় কলকাতার রাজপথে জনসমুদ্র।

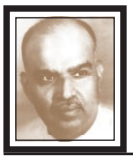

এই অস্বাভাবিক ঘটনার রহস্য কি?

তাঁকে শ্রীনগর জেলে না রেখে শহর থেকে দূরে, একটি মাত্র ঘরযুক্ত, সুযোগসুবিধাহীন নির্জন একটি ছোট্ট বাড়িকে অস্থায়ী কারাগার বানিয়ে সেখানে ড. শামাপ্রসাদ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে রাখা হলো কেন? শ্যামাপ্রসাদ গবেষক ও সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট এস সি দাশ শ্যামাপ্রসাদের জীবনীতে লিখেছেন, 'it was nothing short of criminal to keep a man from the plains with previous heart trouble, in a bleak snake-pit like this.' এদিকে শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নতুন দিল্লির দিউয়ান হলে ১২ মে আহুত এক সভায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ ভিজি দেশপাণ্ডে, রামরাজ্য পরিষদের নন্দলাল শর্মা, এমপি এবং ড. প্রকাশবীর শাস্ত্রী তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তাঁদের সবাইকে ১৫ মে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ২৩ থেকে ২৫ মে প্রধানন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু ওই সময় শ্রীনগরের ডাল লেকের মধ্যে একটি পার্কের উদ্বোধন করেন এবং পরের দুদিন অন্যান্য সরকারি কাজ করেন। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো, শ্যামাপ্রসাদের মতো বিরোধী দলের নেতা পাশের এক কুঠিরে বন্দি থাকলেও তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষৎ করারও প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁরা। আরও রহস্যজনক ব্যাপার হলো, ২৬ মে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত হলো যে, ড. শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দুই সহবন্দি, গুরুদত্ত বৈদ্য ও টেকচাঁদকে দিল্লির কোর্ট অব এনকোয়ারিতে উপস্থিত হবার অনুমতি দেওয়া হবে না। এছাড়াও ড. মুখোপাধ্যায়ের আইনি পরামর্শদাতা উমাশঙ্কর মুলজিভাই ত্রিবেদীকেও একান্তে তাঁর সঙ্গে আইনগত কথা বলতে দেওয়া হয়নি, তাঁর সঙ্গে সর্বদাই শ্রীনগরের ডেপুটি কমিশনার হাজির থাকত। শ্রীবলরাজ মাধোক তাঁর Portrait of a Martyr, A Biography of Dr. Shyamaprasad Mookerjee গ্রন্থে যা বলেছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক। ওই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ''When on being refused permission to take instructions from Dr. Mookerjee in private, Shri Trivedi was planning to return to New Delhi, an important citizen of Srinagar dropped into his hotel room and pleaded with him not to go till he got Dr. Mookerjee released. He warned him that Dr. Mookerjee will be killed, if he was not released early." প্রথমে তাঁকে দেখভালের জন্য একজন এল এম পি ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯ জুন মাঝরাতে তিনি পিঠে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করেন এবং শরীরের তাপমাত্রাও খুব বেশি ছিল। পরদিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ শ্রীনগরের ডাক্তার আলি মহম্মদ তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং বলেন, ড. মুখোপাধ্যায় ড্রাই প্লুরিসিতে ভুগছেন এবং ডাঃ আলি তাঁর জন্য Sterptomycin ইনজেকশন এবং এক ধরনের পাউডার প্রেসক্রাইব করেন। ড. মুখোপাধ্যায় ডাঃ আলি মহম্মদকে বলেন যে, তাঁর পারিবারিক ডাক্তার ডাঃ বসু তাঁকে Streptomycin ইনজেকশন নিতে নিষেধ করেছেন সেটি তাঁর সহ্য হয় না বলে। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার পরেও সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ডাঃ আলি মহম্মদ তাঁর কথা না শুনে তাঁকে একগ্রাম Streptomycin ইনজেকশন দেন ২০ তারিখ রাত ২.৩০ নাগাদ এবং ওই একই পরিমাণ ইনজেকশন ২১ তারিখ সকাল ১০টায় দেওয়া হয়। ওই তারিখেই বিকেল ৪টে নাগাদ তাঁর ব্যাথা ও জ্বর বেড়ে যায়; রাতে তা আরও বেড়ে যায়। পরেরদিন সকালে অর্থাৎ ২২ জুন তিনি বুকে ও আশপাশে ব্যাথা নিয়ে ভোর ৪টে নাগাদ ওঠেন। চারটে পয়তাল্লিশ নাগাদ তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তাঁর সহবন্দি গুরুদত্ত বৈদ্য ও টেকচাঁদ শর্মা তাঁকে লবঙ্গ ও দারচিনি দেন খাওয়ার জন্য। এগুলি খেয়ে তিনি একটু সুস্থ বোধ করেন। পূর্বোক্ত ডাঃ আলি মহম্মদ সকাল ৭.৩০ নাগাদ তাঁকে দেখেন এবং তাঁর হাতে ২ সিসি কোরামিন ইনজেকশন দেন। ডাঃ আলি তাঁকে জানান, তাঁকে হাসপাতলে স্থানান্তর করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে বলবেন। ওই দিনই দুপুর ১২টা নাগাদ ড. শ্যামাপ্রসাদকে একটা ছোট্ট গাড়িতে করে তাঁকে নার্সিং হোমে বা তথাকথিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে রাখা হয় স্ত্রীরোগ বিভাগে। অসুস্থ্য শরীরেও ওই ভ্যানগাড়ি অবধি তাঁকে হেঁটে যেতে হয়। আর জেল সুপার সারাক্ষণ ডানদিকে বসে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি আব্দুল্লাহর বন্দি। সন্ধ্যায় উমাশঙ্কর মুলজিভাই ত্রিবেদি (জনসঙ্ঘের এমপি এবং ড. মুখার্জির কৌসুলি), দেবকীপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় সেখানে ডেপুটি কমিশনারও হাজির ছিলেন; যদিও তাঁকে দেখাশুনার জন্য কোনো ডাক্তার ছিল না। ত্রিবেদি এবং দেবকিপ্রসাদ যতক্ষণ সেখানে ছিলেন ততক্ষণ কোনো ডাক্তার ড. মুখার্জিকে দেখতে আসেননি। জানা যায়, তাঁকে যে ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় সেখানকার ডাক্তার ছুটিতে ছিলেন। সুতরাং, অন্য ওয়ার্ডের ডাক্তার ডাঃ জগন্নাথ জুৎসিকে কাজ চালিয়ে নিতে বলা হয়। ডাঃ আলি মহম্মদ এবং ডাঃ রামনাথ পাহাড় যাঁদের উপর তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল তাঁরা কেউই সেখানে থাকতেন না। তদন্তে দেখা গেছে, ওই দুর্ঘটনার রাত্রে তাঁরা কেউই সেখানে ছিলেন না। ডাঃ আলি কর্তব্যরত একমাত্র নার্স, রাজদুলারি টিকুকে নির্দেশ দিয়ে যান দরকারে নার্স যেন ড.মুখোপাধ্যায়কে Streptomycin ইনজেকশন এবং এক বিশেষ ধরনের পাউডারের পুরিয়া দিয়ে তা খাওয়াতে বলে যান। ড. মুখোপাধ্যায় ৯.৩০-এ আসা নার্সকে শেখ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তাঁর প্রতি উপযুক্ত আচরণ এবং তাঁর সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আবদুল্লাহ করছেন না। তিনি এও বলেন যে, সুস্থ হয়ে তিনি শেখ আবদুল্লাহর এই নিষ্ঠুরতার কথা প্রকাশ করবেন। সেই সময়ে রাজদুলারি টিক্কু নামে একজন

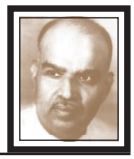

নার্সই তাঁর কাছে ছিল। রাজদুলারীর কথা অনুযায়ী, মৃতপ্রায় সেই নেতা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় একজন ডাক্তারের জন্য কেঁদে উঠেন। কিন্তু সেখানে কোনো ডাক্তার ছিল না। রাজদুলারী সাফাইকর্মী নুর আহমেদকে ডেকে ডাঃ জুৎসিকে ডাকতে বলেন। ডাঃ জগন্নাথ জুৎসি দৌড়ে আসেন এবং দেখেন রোগীর অবস্থা অতি সংকটজনক। তিনি ডাঃ আলিকে ফোন করেন চিকিৎসাসংক্রান্ত নির্দেশের জন্য। ডাঃ আলি রাজদুলারীকে আগের রাত্রে দেওয়া সেই বিশেষ পাউডার ড. মুখোপাধ্যায়কে খাওয়াতে নির্দেশ দেন। রাজদুলারী সেই ঘাতক পাউডার ড. মুখোপাধ্যায়ের মুখে ঢেলে দেন। সময় তখন ২৪ জুন, রাত্রি ২.২৫। ড. মুখোপাধ্যায় ওই পাউডার গেলার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বাংলায় বলে উঠলেন, 'ওহ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল।' এই কথা বলেই তিনি চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। এইভাবে শেখ আবদুল্লাহর কাশ্মীরের কারাগারে ভারতমায়ের সুসন্তান, আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনেতা ও তার কারিগর মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর হাত দিয়ে তাঁর অজান্তে জঘন্যতম কাজ হয়েছে এট বুঝতে পেরে নার্স রাজদুলারী গভীর হতাশা ও অনুতাপে ভেঙে পড়লেন। খবর পেয়ে ডাঃ আলি আধ ঘণ্টা পরে সেখানে পৌঁছান। রাজদুলারী ডাঃ আলিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন তাঁর নির্দেশে তাঁকে (রাজদুলারীকে) এক জঘন্য, ঘৃণিত কাজ করতে হয়েছে। রাজদুলারী ডাঃ আলির কাছে যথার্থ সন্দেহ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন যে ডাঃ আলির দেওয়া পাউডারের ওই বিশেষ পুরিয়াতে নিঃসন্দেহে কড়া ডোজের বিষ ছিল। একথা শুনে ডাঃ আলি মহম্মদ তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে এবং একথা কাউকে না বলতে নির্দেশ দেন। বাইরের কাউকে তাঁর এই সন্দেহ ও এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করলে তাঁর (রাজদুলারীর) এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে ও সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে ডাঃ আলি রাজদুলারীকে হুমকি দেন। এইভাবে রাজদুলারীর মুখ বন্ধ করা হয়। তাঁর বাবার মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে ড. মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী নিশীথরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাশ্মীরে যান এবং ওই নার্স রাজদুলারী টিক্কুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা ড. মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও জামাতা এটা জানতে পেরে রাজদুলারী কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, 'আমি আপনাদের বাবাকে হত্যা করেছি আর এই পাপের জন্য আমি নরকে যাব। এসব তথ্য আমি আর গোপন করে রাখব না। যাই ঘটুক, আমি আপনাদের সত্যি কথাই বলব।' এই বলে তিনি সমস্ত ঘটনার কথা তাঁদের বিবৃতি করেন।

কাশ্মীর সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, ড. মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময় ভোর ৩.৪০ বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নার্স রাজদুলারী টিক্কু এবং ড. মুখোপাধ্যায়ের সহবন্দি গুরুদত্ত বৈদ্যের বিবৃতি অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর সময় রাত্রি ২.২৫। গুরুদত্ত বৈদ্য ও টেকচাঁদ শর্মা ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ড. মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁদের জানানো হয়, ড. মুখার্জি মারা গেছেন। তাঁরা তখন সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে ভেতর গেলে ড. মুখোপাধ্যায়ের দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা অবস্থায় দেখেন। তাঁরা নার্সকে তাঁর মৃত্যু জিজ্ঞেস করলে নার্স তাঁর মৃত্যু সময় রাত্রি ২.২৫ বলে উল্লেখ করেন। পরদিন সকাল ১০.৪০ নাগাদ একটা ডাকোটা বিমানে তাঁর দেহ কলকাতায় পাঠানো হয় যা ওইদিন রাত ৯টায় কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছায়। অথচ কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বকশি গোলাম মহম্মদের কথা অনুযায়ী প্লেনটি বিকেল তিনটেয় পৌঁছে যাবার কথা— কিন্তু বাস্তবে শ্রীনগর থেকে কলকাতা পৌঁছাতে লাগে সতেরো ঘণ্টা— প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরি করে। তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে আসেন দলীয় নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী, বলরাজ মাধোক ও পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা।

এখন প্রশ্ন হলো, কে বা কারা তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য দায়ী? কিছু ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতরূপেই সেটা অনুধাবন করা যায়। সেই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর সদর-ই-রিয়াসত ছিলেন যুবরাজ ড. করণ সিংহ, অথচ তাঁর চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছুই তাঁকে জানানো হয়নি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই রহস্যজনক মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এক পত্রে তা জানিয়েছিলেন। ড. করণ সিংহ তাঁর আত্মজীবনী Heir Apparent গ্রন্থে উদ্ধৃত জওহরলালকে লেখা এক পত্রে লিখেছেন, The circumstances in which he died in the custody of the State Govt. were a cause of great resentment and suspicion. Jammu was furious because Dr. Mookerjee had been martyred while fighting for the Praja Parishad cause and there was open talk that his death has not been for natural causes. The whole of India was shoked at this event, specially the people of Bengal, who hold Dr. Mookerjee in the highest regard.

তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন ড. এম আর জয়াকর, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, প্রজা সোশ্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগড়া, কে এস পি নেতা এস এস মোরে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অকালি দলের সভাপতি মাস্টার তারা সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষ নেতৃগণ।

ড. এম আর জয়াকর বলেন, রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্ত যে অত্যন্ত প্রয়োজন সেকথা আমি আগেই পরিষ্কারভাবে বলেছি।' ড. জয়াকর আরও বলেন, 'ড. মুখার্জির চিকিৎসা ঠিকমতো হয়নি।' বিশিষ্ট জননেতা এইচ ভি কামাথ বলেন, 'এক পক্ষকাল আগে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর

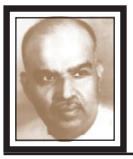

অবস্থার উন্নতি হলো না, তখন কেন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো না? প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির নেত্রী এবং পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী (মজুমদার) কলকাতার এক জনসভায় বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, 'আজকের স্বাধীন ভারতে কীভাবে ড. মুখার্জির মতো নেতাকে বন্দিদশায় এবং ওই পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ...সরকার যদি এ ব্যাপারে তদন্তের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে জনসাধারণ ধরে নেবে ড. মুখার্জির মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু রহস্য আছে যা সরকার গোপন করতে চান।'

শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নয়, দেশের সাধারণ মানুষ এবং বহু কৃতবিদ্য চিকিৎসাবিদগণও ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেন। কৃতবিদ্য চিকিৎসাবিদদের মধ্যে ডাঃ বি এন খাবে, ডাঃ টি এল ব্যানার্জি, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী ও আজমের ও গোয়ালিয়রের বহু চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন ড. মুখোপাধ্যায়ের যথোপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ ও তাঁর পরিবারের দাবি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কারো কোনো কথায় কর্ণপাত করলেন না। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তের কোনো ব্যবস্থা তাঁরা করলেন না, পরন্তু তাঁরা এই তদন্তের দাবি ধামাচাপা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের আইনি পরামর্শদাতা এবং দলীয় সাংসদ উমাশঙ্কর মুলজিভাই ত্রিবেদী ২৫ জুন, ১৯৫৩ সালে তাঁর লিখিত বিবৃতিতে তাঁর চিকিৎসার ত্রুটি সংক্রান্ত ১১টি বিষয়ের উল্লেখ করে প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করেন। এই প্রবন্ধের পরিসরে সে আলোচনার সুযোগ নেই। যাইহোক, ত্রিবেদীর এই দাবিও যথারীতি অগ্রাহ্য হয়।

ড. মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসা গাফিলতি এবং তাঁর মৃত্যুর তদন্তের দাবি মেনে না নেওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর এই অকাল মৃত্যুর পেছনে দায়ি কুশীলবদের ভূমিকা। সংসদে তাঁর উপস্থিতি সমস্ত সদস্যদের তাঁর বক্তব্য শুনতে আকৃষ্ট করত, তাঁরা তাঁর ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন। তাঁর শাণিত প্রশ্নবাণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বিহ্বল করে তুলত; তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে নেহরু হিমশিম খেতেন। অনেক সময় নেহরু তাঁর বাক্যবাণের কাছে পরাজিত হয়ে মেজাজ হারাতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ড. মুখোপাধ্যায়ের থেকে অব্যাহতি চাইতেন। আর তাছাড়া নেহরুর একটা বদগুণ ছিল, যাকে তিনি পছন্দ করতেন না, তাকে তিনি মঞ্চ থেকে কোনো না কোনোভাবে অপসৃত করতেন। বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, জিবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনি, জয়প্রকাশ নারায়ণ ইত্যাদি নেতাদের তিনি কংগ্রেস রাজনীতি থেকে অপসৃত করেছেন তাঁর অসপত্ন কর্তৃত্ব কায়েম করতে। ড. শ্যামাপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তিনি সেটাই চাইতেন। আবার অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ কাশ্মীরে তাঁর কর্তৃত্ব একচ্ছত্র করতে শুরু থেকেই তৎপর ছিলেন। তিনিও জওহরলাল নেহরুর মতো একই চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনিও কারো বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মহারাজা হরি সিংহকে অপসৃত করে তাঁর পুত্র যুবরাজ ড. করণ সিংহকে গুরুত্বহীন সদর-ই-রিয়াসত পদে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতালিপ্সায় বাধ সাধে জম্মুর সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের জনপ্রিয় সংগঠন জম্মু প্রজা পরিষদ। পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে প্রজা পরিষদ জম্মুতে ৩৭০ ধারা বাতিল, কাশ্মীর উপত্যকার একমুখী অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির দাবিতে প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ড. মুখোপাধ্যায় প্রজা পরিষদের এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ফলে এই আন্দোলন তীব্র গতি পায়। ফলে প্রেমনাথ ডোগড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদকেও শত্রু গণ্য করতেন। এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের তুতোভাইয়েরা এক মঞ্চে শামিল হলো। ভারত এবং কাশ্মীরের রঙ্গমঞ্চ থেকে শ্যামাপ্রসাদকে অপসৃত করার নীলনকশা তৈরি হয়ে যায়। কেন্দ্রের জওহরলাল নেহরুর শ্যামাপ্রসাদকে পারমিট ছাড়া কাশ্মীরে ঢুকতে দিতে সমস্ত সহায়তা করা, কাশ্মীর পুলিশের অবৈধভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার, দিল্লির কোর্টে সাক্ষ্য দিতে না আসতে দেওয়া, তাঁকে এক নির্জন স্থানে কারাগার বানিয়ে সেখানে বন্দি রাখা, পদে পদে চিকিৎসায় গাফিলতি এবং বলা সত্ত্বেও ভুল ওষুধ প্রয়োগ করে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেকে দেওয়া এক বৃহৎ ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। তাঁর মৃত্যুর পরে সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করে তদন্ত না করা এসবই সেই চক্রান্তের অঙ্গ।

পুনশ্চ : ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত 'লিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' বার্ষিক সম্মেলনে কলকাতার দুটি নামকরা সংবাদপত্রের সাংবাদিক গিয়েছিলেন। সেই সাংবাদিক দুজন, আনন্দবাজারের অপূর্ব সেনগুপ্ত এবং যুগান্তর পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। কলকাতার সাংবাদিক জেনে শেখ আবদুল্লাহ বলেন ওঠেন, 'আপনাদের ধারণা, আমি ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আমি Killer অর্থাৎ হত্যাকারী নই, হত্যাকারী আরেকজন।' কে সেই হত্যাকারী তা আবদুল্লাহ পরিষ্কার করেননি। তবে তিনি 'কিলার' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

উপরে প্রদত্ত সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি, হত্যাকারী কে। কিন্তু আমরা চাই, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি, ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে, তার মাধ্যমে সঠিক তদন্ত করে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত খুনিকে সনাক্ত করুক এবং দেশবাসীকে তা জানাক। সেটাই হবে তার প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ▯

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

A Historical Journey Since 1940

GODAVARI COMMODITIES LTD.

(Bhutoria Group of Company)

SINGLE SOLUTION ORGANISATION ON COAL

Business Interests :

Coal Handling * Trading of Coal * Mine Outsourcing * Mining of Coal * Consultancy of Coal Mining * Real Estate * Finance

18, N. S. Road, 2nd Floor, Kolkata- 700 001

Phone : +91-33-2242 6134/8972

Fax : +91-33-2242 6160

Email : imbgodavari2@gmail.com

Assansol, Durgapur, Andal, Ranigunj, Dhanbad, Ranchi, Ramgarh, Khelari, Singroli, Korba, Nagpur, Brijrajnagar, Talchar

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street

4th Foor

Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

CHOOSE THE BEST

DURO™

- LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION
- TRIPLE HEAT TREATED
- DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY
- MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL
- LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
5 July - 2021 - Rs. 12.00 Shyamaprasad Spl. issue
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।